আল মাহমুদের কবিতা



AL MAHMUDER KABITA
(Poems of Al Mahmud)

গ্রন্থপরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী : আবদুল মোহিত



হরফ সংস্করণ
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১

আবদুল আজীজ আল্-আমান
হরফ প্রকাশনী
এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ৭০০০০৭

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য
আনন্দবাজার

মুদ্রণ
স্বদেশী প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রা লি
৫৮ এ/বি লোয়ার রেঞ্জ
কলকাতা ৭০০০১৯

ভূমিকা

কবিতা সম্বন্ধে এমনিতেই আমি যাকে বলে অনিবার্য কথাবার্তা ঠিকমত বলতে পারিনা। আর যদি আসে নিজের কবিতা বিষয়ে কিছু বলার ব্যাপার তাহলে তো ভয়ের আর সীমাই থাকেনা। কিভাবে কখন কবিতা লেখা, কবি হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল আজ আর মনে করতে পারছি না। তবে এটুকু মনে আছে যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলাম সেখানে কবিতা রচনাকে একটা দুর্লভ গুণ বলে স্বীকার করা হতো।

আমি লিখতে শুরু করি মধ্যপঞ্চাশ অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫-র দিকে। তখন আমার মত আন্দোলনহীন কবিদের পাত্তা পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিলো না। তবুও শেষ পর্যন্ত কবিদের ভাগ্যে যা ঘটে, কিছু পাঠক আর বিচিত্র ধরনের খানিকটা প্রশংসা জুটেই যায়, আমার ভাগ্যও তার বিপরীত নয়।

কবিতা রচনার বেলায় আমি আমার নিজের জন্য একটি সুবিধামত ভাষা তৈরী করতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দারাজির সন্ধান পাই। এই শব্দ-সম্ভার জীবন্ত এবং বহমান। খুব ব্যাপকভাবে না পারলেও আধুনিক বাংলাভাষার গতিপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচুর শব্দরাজি আমি আমার রচনায় ব্যবহার করে পরিতৃপ্ত।

প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশভূমিই আমার রচনার বিষয়বস্তু বলে ভাবতে আমার ভালো লাগতো। যেমন ভাবতাম, পুরুষ অর্থাৎ কবির কাছে নারীর চেয়ে সুন্দর দৃশ্যমান জগতে আর কি আছে ? আর কি কি আছে খুঁজতে খুঁজতে আমি সারা নিসর্গমণ্ডলকেই এলোমেলো করে ফেলেছি। এখন আর একের সাথে অন্যকে মেলাতে পারিনা। জাগতিক সব সৌন্দর্যবোধই শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিকর। যেমন হাস্যকর নদীর সাথে নারীর তুলনা। কবির প্রিয়তমা নারীর সাথে নিসর্গের কোনো তুলনা হোক বা না হোক কবির একটি প্রধান কাজ হলো এই উপমা উত্থাপন করে যাওয়া।

প্রাণের সাথে প্রকৃতির এবং দৃশ্যমান জগতের বস্তুনিচয়ের পরস্পরের তুলনা-প্রতিতুলনার সফলতা ও ব্যর্থতাই সম্ভবত কবির জীবনকে অধিকার করে থাকে। শব্দ, ছন্দ ও মিলের পারদর্শিতা হলো আঙ্গিক-গঠনের বাইরের ব্যাপার। ভেতরে আসলে কেবল উপমারই জালবোনা। ক্রমাগত তুলনা দেওয়ার পারদর্শিতার যে আনন্দ ও কম্পমান অবস্থা তা কবির তারুণ্যকে অতিক্রম না করলেই সম্ভবত কবির জীবনে সার্থক সুখানুভূতি জন্মে। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি সেই তারুণ্যকে অবহেলায় অতিক্রম করে এসেছি। এখন আর প্রাণের সাথে প্রকৃতির তুলনা আমাকে তৃপ্তি দেয় না। বরং ছেলেখেলা মনে হয়। মনে হয় আমার সামান্য বিদ্যা, ভ্রমণ, কৌতূহল ও উপর্যুপরি

দিকভ্রান্তির শাস্তি স্বরূপ এক অতুলনীয় শক্তি আমাকে তাঁর অদৃশ্য জগতের দিকে চালনা করছে। আর মরণের কথা একদিনও মনে করতে না চাইলেও, মৃত্যু তো আসবেই।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কবির অসহায়তা ও জীবিকার অনিশ্চয়তা অন্যান্য কবির মত আমাকেও কোথাও স্থিরভাবে দাঁড়াতে দেয়নি। আর আমি-তো জন্মেছি পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশে। কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছে এর প্রতিকার চিন্তায়। এর প্রতিকার যে মানুষের হাতেই, এতে আমার সন্দেহ নেই। তবে মানবরচিত কোনো নীতিমালা বা সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের কাম্য সুখ, আত্মার শান্তি বা স্বাধীনতা কোনোটাই সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা। হলে কবির স্বপ্ন, দার্শনিকের অনুসন্ধিৎসা বা সমাজবিজ্ঞানীর বিপ্লবচিন্তা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নামিয়ে আনতে পারতো। পারেনি যে এতে কবি বা বিজ্ঞানীর কোনো হাত নেই। এতে যাঁর হাত তিনি কবি, দার্শনিক বা বিজ্ঞানীর প্রতি করুণাধারা প্রবাহিত করলেও পক্ষপাত দেখিয়েছেন অন্যধরনের মানব শিক্ষকগণের প্রতি। সেই মহা মানবগণ হলেন নবী সম্প্রদায়। সম্প্রদায় বললাম, কারণ তাদের আগমন-নির্গমনের পরম্পরা ও তাদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা যে পার্থিব শৃঙ্খলার প্রমাণ বহন করে তাতে তাঁদের একটি ভ্রাতৃসম্প্রদায় বলে উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত। আর আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী হযরত মোহম্মদ (তাঁর ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক) তো তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে প্রায় প্রতিবারই 'আমার ভাই' বলে সম্বোধন করতেন।

বলাবাহুল্য যে পবিত্র কোরান পাঠ জগত ও জীবন সম্বন্ধে আমার অতীতের সর্বপ্রকার ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধকেই পাল্টে দেয়। এমনকি সৌন্দর্যচেতনা ও কবিসভাবকেও।

কবিকেও কোথাও না কোথাও পেঁৗছতে হয়। একদিন ফিরে আসতে হয় পৃথিবীর মায়াবী দৃশ্যপট ছেড়ে। কত ভালোবাসার হাত অবশেষে শিথিল হয়ে ঝরে পড়ে। যে সব অপরূপ উপত্যকায় কবি বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন সেখানে সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিমালা বর্ণ ও তেজ হারিয়ে নিভে যায়। নিঃসঙ্গ কবির মনে প্রশ্ন জাগে, আমি তবে কোথায় যাবো ?

শেষের দিকের কবিতায় আমি আমার গন্তব্য সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসকে ব্যক্ত করেছি। আমি মনে করি কবি হিসাবে আমার এই বিশ্বাসই আমার সার্থকতা।

আল মাহমুদ

সূচীপত্র

লোক লোকান্তর

কালের কলস

সোনালি কাবিন

মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো

অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না

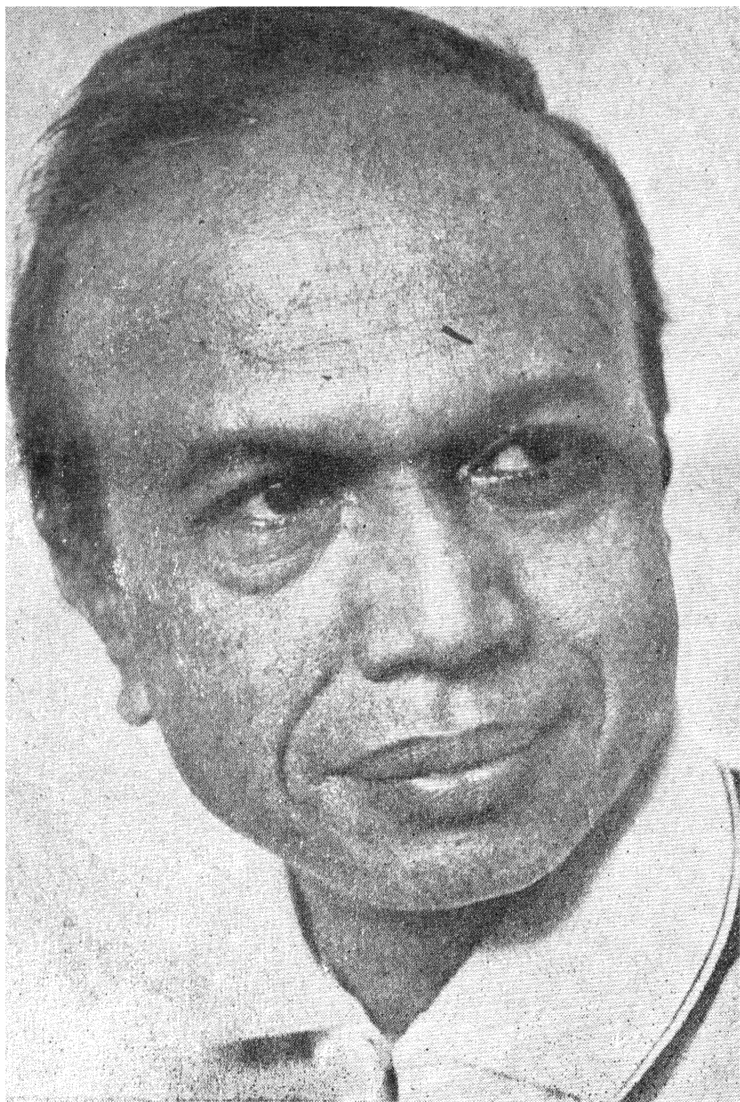
বখতিয়ারের ঘোড়া

পাখির কাছে ফুলের কাছে

আল মাহমুদের কবিতা



আল মাহমুদ



আল মাহমুদ



আল মাহমুদ ও স্ত্রী নাদিরা বেগম



আল মাহমুদ

লোক লোকান্তর

বিষয়ী দর্পণে আমি

ক'বার তাড়িয়ে দিই, কিন্তু ঠিক নির্ভুল রীতিতে
আবার সে ফিরে আসে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে
তার সেই মুখখানি কুটিল আয়না হয়ে যায়
নিজেকে বিম্বিত দেখি যেন সেই মুহূর্তমুকুরে।

ভয়াবহ ভূতের আর্শিতে
আমাকে পশুর মতো মনে হতে থাকে। ধূসর হাওয়ায়
পাশব কেশর ওড়ে, অনাচারী বিষয়ী নখর
নষ্ট করে গাছপাতা নারীশিশু জনতা শহর !

কখনো অসৎ থাবা অকস্মাৎ উত্তোলিত হলে
দেখি সেই বিম্বিত পশুর
দর্পিত হিংস্র চোখ আমাকেই লক্ষ্য করে জ্বলে :
চিবুক লেহন করে, সে অলীক মুহূর্তের ক্রোধ
জয় করে দেখি আমি, কেবলই আমার মধ্যে যেন এক
শিশু আর পশুর বিরোধ।

প্রত্ন

পাথর পাহাড় খুঁড়ে মিলেছে যে করোটি ও হাড়
বিস্ফারিত চোখে দেখি আত্মীয়ের জংধরা খুলি,
কেমন মমতা বাড়ে, হাতে নিই ঝেড়ে মুছে ধুলি,
কালোত্তীর্ণ রক্ত যেন কেঁপে ওঠে তোমার আমার।
কখনো বর্শার ফলা কখনোবা পাথরের তীর,
যূথবদ্ধ জীবনের নারীদের অলঙ্কার, আরো--
এখানে দাঁড়িয়ে তুমি যত খুশী ভেবে নিতে পারো
তোমার রক্তের পিছে ইতিহাস কতটা নিবিড়।

মুখের রেখায় শেষে হেঁটে গেলো গাম্ভীর্যের হিম
বুদ্ধের মূর্তির পাশে তুমি আমি নিষ্পলক চেয়ে
গভীর প্রশান্তি যেন আমাদের রক্তে আছে ছেয়ে
নির্বাক দুজন শুধু ; ইতস্তত ছড়ানো আদিম।
মহেনজোদারোর সে মৃৎপাত্রে লেখা কি-যে নাম
আমরা বুঝিনি ঠিক আশেপাশে কত হাঁটলাম।

তিমিরতীর্থে

একদিন হেঁটে হেঁটে সেই ব্রতচারী
চলে এলো অন্ধকার রাতের মন্দিরে,
এ-রাতের অধিষ্ঠাত্রী পাথরের নারী
যেখানে বেদীর 'পরে আদিম তিমিরে।
সেখানে নীরবে এসে দাঁড়ালো সে-ছেলে
জন্ম যার ধুলোওড়া আলোর শহরে,
সোনার বাটিতে কিছু গন্ধধূপ জেবলে
বললো সে, ঠাঁই দাও রাতের এ-ঘরে ;
আমরা শরীরে হানো পাথরের হিম
আমার দু'চোখে দাও মায়াবী আঁধার
সোমরসে হৃদয়ের ব্যর্থতার নিম
ধুয়ে মুছে মুক্তি দাও এই যন্ত্রণার।

হঠাৎ দু'চোখে বুঝি নেমে এলো ঘুম
শরীর এলিয়ে দিলো কঠিন বেদীতে
শীতের বাতাসে তার নিভে গেলো হোম
ছিঁড়ে গেলো হৃদয়ের যন্ত্রণার ফিতে।

ক্লান্তি তার ধুয়ে ফেলে ঘুমের লেগুনে
আবার দু'চোখ মেলে রাতের বিলাসী
বললো, দু'চোখে দাও স্বপ্নজাল বুনে
আমার অধরে দাও পাথরের হাসি।

প্রতিকৃতি

চোখে তার রক্ত নেই, তার মুখ ধূসর ধূমল
সূর্যের আহ্নিক রঙে প্রতিদিন জ্বলে তার চুল,
তবু সে পাথর নয়, কভু তার চোখে নামে জল
আকাশেই দৃষ্টি মেখে হয়ে থাকে নিমেষ বিভুল।

কখনো সে বসে থাকে ঠেস রেখে পুরানো প্রাচীরে
দু'পাশে ছড়ানো থাকে ধসে পড়া ইট কাঠ চুন,
এভাবেই সন্ধ্যা নামে, সব পাখি ফিরে যায় নীড়ে—
দেহ ছুঁয়ে নাচে তার মিটি মিটি জোনাকি আগুন।

কখনো ভোরের রোদে শিশিরের রেণু মেখে পায়
সে পুরুষ হেঁটে যায় কুয়াশায় দেহ যায় ঢেকে,
আবার দুপুরে দেখি ঘুমিয়েছে প্রাচীর ছায়ায়
কি জানি কি স্বপ্ন নিয়ে কঠিন পাথরে মাথা রেখে,—
সে এক অবাক লোক মুখ তার ধূসর ধূমল,
কোনো নারী কোনদিন তার তরে মাখেনি কাজল।

রাত

আলোটা উসকে দিই ? বললো সে। বললাম, থাক।
আঁধারে কিসের গন্ধ আমাকে বুঝতে দাও জেগে
একটু নীরব থেকে দেখা যাক কিসের আবেগে
মানুষের ঘুম পায়। যাও তুমি। পৃথিবী ঘুমাক।

হাই তুলে হাসলো সে। তারপর সরে গেলো দূরে।
তার দেহে লেগে বুঝি এই রাত্রি গাঢ় হলো আরো
জমাট চুলের রঙ হাত দিয়ে যত তুমি নাড়ো
একটুও মুছবে না।

তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধকার খুঁড়ে
আমি তাই খুঁজি শুধু কোথা আছে ঘুমের আফিম
আদিম ক্লান্তিতে যেটা আমার শরীর বেয়ে নামে
অথবা এলিয়ে দেয় বিছানায় নিবিড় আরামে
শিথিল দেহের তাপে ভরে ওঠে ঘুমের জাজিম !

তৃষ্ণার ঋতুতে

শুধু কি ধুলোর পথ ? কতদূর যাবো আর হেঁটে
এও তো রৌদ্রের দিন ঝকমকে পিপাসার ঋতু
জীবিকাবিজয়ী প্রাণ আজ যেন মনে হলো ভীতু
বিন্দুও পাবে না আর ব্যর্থ জিভে জলপাত্র চেটে।
মায়ের দেহের মতো চিরচেনা এই সে শহর !
জলসত্র খুঁজেছি তো পাইনি সে কুম্ভভরা জল
পাইনি মেঘের মূর্তি যার পায়ে বেজে ওঠে মল
বৃষ্টির শব্দের মতো, হাসি যার কাঁপায় প্রহর।

জীবিকাবিজয়ী দেহে কোন ঘরে দাঁড়াবোরে আজ
কাকের ধূর্ততা নিয়ে ফিরেছি তো এখানে ওখানে
খুঁজেছি জলের কণা থর থর ধুলোর তুফানে
এখন বুঝেছি মানে—এও এক নারকী সমাজ ;
জলসত্র নেই কারো এই শেষে মেনে নিলো মন.
ধুলোকে এড়িয়ে আর কারো ঘরে যাবো না এখন।

অন্ধকারে একদিন

একদিন ঘরে এসে হৃদয়ের প্রিয় শয়তান
ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো টেবিলের মোম
নির্বিকার দেহ ঢেকে অন্ধকার আলখেল্লার নিচে
ম্লান হেসে বিছানায় বসে
মায়াবী কথার ফাঁকে বোঝালো সে ঃ প্রভুর শহরে
আমি নাকি যেতে পারি ! অপরূপ নিষিদ্ধ বিতান
পার হয়ে, চোখের পলকে
অলৌকিক ফলবতী বৃক্ষের নিচে।

বললাম, তীক্ষ্ণধার আমার কিরিচে
অলৌকিক স্পর্ধা দাও। ঈশ্বরের অপরূপ ফল
আমি যেন বিদ্ধ ক'রে নিতে পারি। যেন
ভাগ করে দিতে পারি—আমার সে প্রিয়তমা নারীকে কেবল

প্রবোধ

যতই অসহ্য হই ঘাম ঝরে তত
ফুটপাত তেতে ওঠে সারাদিন রোদে
সন্ধ্যায় ঘরে ফিরি ক্ষতবিক্ষত।

অন্তহীন যন্ত্রণায় রক্ত জ্বলে বুঝি।

তারপর নষ্ট এক গণিকার মতো
অন্ধকার ডাক দেয় নিবিড় প্রবোধে ঃ
আসুন বাবুজী।

সিম্ফনি

ভেবেছি তো অন্ধকারে আমি হবো রাতের পুরুত
আদিম মন্দিরে একা তুমি এসো নগ্নতার দেবী,
মগ্নতার অন্ধকারে আমি যার একমাত্র সেবী,
ধূপের গন্ধের স্বাদ দেবে এনে এখন যে দূত—
সে তো শুধু গন্ধবহ পৃথিবীর পুষ্পময় মাস
পুরানো মদের গন্ধে ভরা যার রাতের বাতাস,
অসহ্য আনন্দ হেনে তোমাকেই করে যে নিখুঁত,
অথবা হৃদয়ে ঢালে যন্ত্রণার করুণ নির্যাস।

শুরু হোক স্তোত্রপাঠ গন্ধবতী তোমার সুনামে,
পীতাভ ধোঁয়ার তলে ডুবে যাক মন্দির-দেহলি,
শঙ্খমাজা স্তন দু'টি মনে হবে শ্বেতপদ্ম কলি,
লজ্জায় বিবর্ণ মন ঢেকে যাবে ক্রিসেনথিমামে—
অথবা রক্তের নাচে শুরু হবে সিম্ফনির সুর
বৃষ্টির শব্দের মতো মনে হবে তোমার নূপুর।

সমুদ্র-নিষাদ

কখন যে কোন্ মেয়ে বলেছিলো হেসে ঃ
নাবিক তোমার হৃদয় আমাকে দাও,
জলদস্যুর জাহাজে যেয়ো না ভেসে
নুন ভরা দেহে আমাকে জড়িয়ে নাও।

জল ছেড়ে এসো প্রবালেই ঘর বাঁধি
মাটির গন্ধ একবার ভালবেসে
জল ছেড়ে এসো মাটিতেই নীড় বাঁধি
মুক্তো কুড়াতে যেয়োনা সুদূরে ভেসে।

সে তো বলেছিলো, নীল পোশাকটি ছাড়ো
দু'চোখে তোমার সাগরের ফেনা মাখা,
আকাশের রং হৃদয়ে কি এতো গাঢ় ?
গাঙচিল-মন ঢেউয়ে ঢেউয়ে মেলে পাখা !

(আমাকে তখন বললো দুলিয়ে শাখা
দূর পাহাড়ের অতিকায় এক পাম ঃ
গাঙচিল-মন বন্ধ করো না পাখা
ওদের হৃদয়ে কখনো এঁকোনা নাম।)

স্বপ্নের মতো মেয়েটিকে বলি শোনো,
ঢেউয়ে ভেসে গিয়ে নামবো অথৈ তলে,
কেনো মিছেমিছি তটের বালুকা গোণো
নেমে এসো সাথে মানিক কুড়াবো জলে।

মেয়েগো হৃদয়ে সাগরের সুরজাল
জীবন কেটেছে কত তাইফুন ঝড়ে
জলদস্যুরা করবে যে গালাগাল
জন্ম নিয়েছি জলদস্যুর ঘরে।

আমরা পারি না

আমাদের দুঃখকে আমরা ফোটাতে পারি না, নদী
ফোঁটায় যেমন তার ঢেউগুলি ব্যথার তড়িতে,
ফেনার ফোঁপানি যেন ছোঁয় এসে পাড়ের হরিতে,
পারি না তেমন করে আমরা তো স্পষ্ট কিছু, যদি
পারতাম,, যেমন রজনীগন্ধা রাত্রির বাতাসে
নতুনত্ব দেয় কিছু—প্রত্যহই পারে গন্ধ দিতে
যেমন পেঁচার ডাক শৈশবের ভয় নিয়ে আসে,
রাতের হলদে পাতা ঝরে যায় শীতের গতিতে !

মানুষের শিল্প সে তো নির্বোধের নিত্য কারিগরি
রুমালের আঁকা দাগে রঙিন সুতোয় ফুল তোলা,
সাপের অলীক চিত্রে নির্বিষ সাজানো কালো দড়ি,
কাদার মূর্তিতে কারো সাধ্যমত আঁটা পরচুলা।

আমরা যা করি, গড়ি, ইচ্ছেমতো আঁকি ও ফোটাই
কাগজে, পাথরে কাঠে, রঙচঙ দ্বিতীয় শ্রেণীর
সেতারে নিবিষ্ট হয়ে যতটুকু উত্তাপ উঠাই
কমদামী কারুকর্ম সবি যেন ! বেশ্যার বেণীর
নকল গোলাপ গোঁজা পাশবিক অশ্লীল রাতের
গন্ধহীন গুমোট মিলানো। তাই হাতুড়ি ছেনির
ফেরাবার সাধ্য নেই রুচি এই অসিদ্ধ হাতের।

স্বীকারোক্তি

তোমার রক্তে নূপুর বাজানো আকাঙ্ক্ষা সেই
এসেছিলো কিনা এতো ঝামেলায় আজ মনে নেই।
দার্শনিকের ছাত্রের মতো আমি তো তখন
নালন্দার সে প্রকোষ্ঠে বসে মৃত দর্শন
হাতড়ে মরেছি, মেধাবী মনের ঢেলে ঢেলে রস
উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পুষেছি বিত্ত ও যশ
ঝুলি ভরে নেবো।

দু'চোখ রাঙাবো বোকাদের চোখে।
দু'হাত ঘুরিয়ে সময়ের স্রোতে দেবো তাল ঠুকে।
কিন্তু এখন ভাবতেই দেখি ছুটে গেছে রং
ভেঙে গেছে সব মিথ্যে মোহের অকেজো ভড়ং।

অধ্যয়নের শেষ প্রদীপটি নিবু নিবু জ্বলে
চার কোণ হতে নিটোল আঁধার ছলে কৌশলে
এগোতে চাইছে।

সুগন্ধী ধূপ পেয়েছে যে লোপ
দেহের দু'পাশে গজাবে এবার কবরের ঝোপ ঃ
সব দর্শন ম্লান হয়ে ওড়ে। সময়ের ছক
পার হয়ে দেখি সাহসীর মতো ঘেঁটেছি নরক।

অরণ্যে ক্লান্তির দিন

এখানে ঘটে না কিছু, শুধু এক আশার পাষাণ
বুকে নিয়ে জেগে থাকা, পিলসুজে পুড়ে যায় তেল
পাহাড়ি খড়ের চাল ঝড়ে জলে জীর্ণ হয়ে যায়
বাতাসে কপাট নড়ে, উড়ে যায় বিছানা চাদর ;
মেঝেতে ছড়িয়ে থাকে পদাবলী প্রাচীন কবির।
কোন গাঁ'র কার মেয়ে মোম জেবলে দরগাতলায়
কি যেন প্রার্থনা করে। তারপর সবুজ সুন্দর
শাড়িতে শরীর ঢেকে হেঁটে যায় সহজ আয়েসে।
অথচ ঘটে না কিছু। যেন এক স্থিতির পাথর
সব কিছু বেঁধে রাখে। মাঝরাতে পায়ের ব্যথাটা
হঠাৎ মুচড়ে ওঠে ; দু'অক্ষর লেখার বাসনা
নীরবেই মরে যায়। হা-ঈশ্বর, তখন একাকী
বিষণ্ণ দু'চোখ বুঁজে প'ড়ে থাকি চেয়ারে কেবল।
অন্তহীন অন্ধকার বোঝে যেন নিজের ছলনা।

কখন যে চাঁদ ওঠে আড়াআড়ি পাহাড়ের ফাঁকে ঃ
যেন কার পাথুরে স্তনের কাছে ঝুলে আছে শাদা
চাঁদির লকেট। দূরে, অতিকায় পাহাড়চূড়োয়
অপার্থিব আলো জবলে শিবের মন্দিরে। আর ভাবি
আমার মতন বুঝি জেগে আছে সেখানেও কেউ
অসংসারী, শঙ্কাহীন, মিথ্যে কোনো মায়াবী আশায়।

কিন্তু তবু ঘটে না কিছুই, আকাশ তেমনি থাকে,
কি ক'রে যে ভোর হয়, আসে যায় ঋতুর পাখিরা
বসন্তের কত ফুল অলক্ষ্যেই ফল হয়, পাকে ;
গভীর অরণ্য ছেড়ে উড়ে আসে বুনো মুরগীরা,
বানরের চেঁচানিতে ভ'রে যায় সেগুনের শাখা।
ঝুড়িতে সবজি নিয়ে হেঁটে আসে চাক্‌মা কিশোরী,

বিচিত্র কাপড়ে বাঁধা ঘামে-ভেজা উপচানো বুকে
বনের রহস্য কাঁপে যেন। ভুরুতে ক্লান্তির নুন
গ'লে পড়ে গালের দু'পাশে। আর আমি নির্বিকার
হতাশার মতো শুধু চেয়ে থাকি অরণ্যের দিকে।

অরণ্যে অসুখী

অরণ্যে স্বাধীন সবই, জোঁক, ব্যাঙ, তরুণ হরিণ
বাঘের দারুণ চোখ, ঝোরার সচল জলে সাপ
আর এই আগাছার বন্য ফুল তাও যে রঙিন !
বনমুরগীর ডানা, প্রস্রবণে তরল আলাপ
বাতাসে পাশব গতি, পাষাণের উদ্যত চিবুক
সবারই স্বতন্ত্র সত্তা, প্রত্যেকের সহজ সাহস
একাকী অমিই শুধু, আমি যেন কেমন অলস
বনে কারো দুঃখ নেই আমি ছাড়া, আমারই অসুখ—

রক্ত, ঘাম, ব্যথা, তৃষ্ণা অবিরল বমি ও হতাশা
একটু বৃষ্টিতে সর্দি, কার্তিকেই কেঁপে ওঠে হাড়।
জঙ্গলে জীবন নিয়ে সবাই খেলতে চায় পাশা।
কিন্তু কি অনড় আমি, আমি আর ওই যে পাহাড়
পরস্পর বৃদ্ধ দু'টি বেঁচে থাকা চাই চিরকাল
অথচ অরণ্যে সবই সদ্য ফোটা প্রথম মাতাল।

তার স্মৃতি

সহজে খোঁজেনি কেউ, কেউ তাকে বোঝেনি সহজে
যখন সে ছিলো এই আমাদের ছেলেমি সমাজে
গাল-গল্পে আন্দোলনে, অতিরিক্ত তর্কেরও মাঝে
সে ছিলো নীরব মেয়ে, কোনদিন নিজের গরজে
বলেনি একটি কথা, অমায়িক দেবী যেন এক
সুস্পষ্ট ঠোঁটের মাঝে আবেগকে বন্ধ ক'রে রেখে
আমাদের কাজে কর্মে শব্দহীন কৌতূহল মেখে
করুণার হাসি হেসে ঢাকতো যে বুক ও বিবেক।

অথচ ভুলিনি তার দু'টি চোখ স্থির কালো টানা
বিচ্ছুরিত হতো যাতে মর্মভেদী আকাঙ্ক্ষার আলো
আমাদের অত্যাচারে যে বলতো, কোনদিন ভালো-
বাসিনি তো কাউকেই, নিরর্থক জ্বালাও আমাকে
তোমাদের মন যেন নতুন পাখির দুই ডানা
দিনরাত ঝাপটায় আর শুধু ইচ্ছে জেগে থাকে।

বৃষ্টির অভাবে

কেন যে আসতে চাও, এ যে বড় ভয়ানক দিন
চালের লতানো ফুল মরে যাবে বৃষ্টির অভাবে
দুঃখের চৌকাঠ ভেঙে যদি আসো, দাঁড়াবে কি ভাবে ?
এখানে যৌবন দ্যাখো কাঁটা-ঘাসে, এমন মলিন !
বাতাসে বিশ্বাস নেই, আঙিনার ধবল পাথরে
আগুন ঠিক্‌রে ওঠে, বুঝি এ-ই দুঃসহ দোজখ
তবু যে আসতে চাও বুঝি না তো এ কেমন সখ
তোমাকে সাহস দেয় দেহ দিতে আমার বাসরে।

নির্জল নির্দয় দেশে পেটে নেবে আমার সন্তান
আঙিনায় রক্ত ঢেলে বসন্তকে ফেরাবে কি নারী
জলের প্রার্থনা ছেড়ে আকাশে তুলবে তরবারি ?
মানবে না তুমি বলো নিয়তির নিরুপম গান !
তাই হোক ! তুমি এসো, কোমরে পেঁচিয়ে নীল শাড়ি
দুঃখের ঘরকে করো শোকোত্তীর্ণ প্রাণের বাগান।

আমি যার ক্রীতদাস মাঝে মাঝে সম্রাটের মতো
উড়ে আসে অবিবেকী সেই যাদুকর।
সোনার মলাটে লেখা পুঁথিপত্র নিয়ে
শেখায় সে মায়াময় যে-সব অক্ষর
সকালেই ভুলে গিয়ে সেই সব শ্লোকময়কথা
হৃদয়ের দলগুলি ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলি।
হয়তো বা ক্ষণকাল ইনিয়ে বিনিয়ে
কেঁদে-কেটে ক্লান্ত হয়ে পুরাতন গাথার ভিতরে
নিজেকে ডুবিয়ে দিই।

ছিন্নভিন্ন হৃদয়ের চামেলি ও বেলী
এক হয়ে অন্য এক লোকোত্তর মানুষকে গড়ে।

পানখ সাপের মতো অন্তরের বিষাক্ত কামনা
মরে গেলে, আবার হারানো কথা আমার অধরে
ফিরে এসে উচ্চারিত হতে থাকে ধীরে
যেন মনে হয়,
পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ছিলো বুঝি
আমাদের কয়েকটি কবির হৃদয়।

নগ্ন পটভূমিকা

আমারই স্তব্ধতায় যেন এক জীবন্ত জোনাকী
ঘোরে ফেরে জ্বলে ওঠে, এক বিন্দু হীরের চমক
জন্তুর আলস্য নিয়ে অন্ধকারে চোখ বুঁজে থাকি
অক্লান্ত অন্তরে বাজে বিধাতার হেঁয়ালি ঠমক।
যতটুকু পারা যায় বারবার ঈশ্বরের মুখ
নিপুণ চেষ্টায় আঁকি হৃদয়ের নির্বিকার পটে,
নিদারুণ শিল্প হয়ে ফিরে আসে আমারই চিবুক
প্রচ্ছদের মাঝখানে নিরন্তর একই ভুল ঘটে।

তাও শেষে থেমে যায়, থাকে না সে রঙ আর রেখা
নির্জন পটের মধ্যে হেঁটে আসে পোকাটা তখন ;
আগুনের নীল বিন্দু দিয়ে যায় মুহূর্তের দেখা,
নগ্ন পটভূমিকায় চেয়ে থাকে একমাত্র মন।
হয়তো বুঝি না এই ছলাকলা আমরা, কারণ
আমাদের স্তব্ধতায় আমরা যে ভয়ানক একা !

তিতাস

এ আমার শৈশবের নদী, এই জলের প্রহার
সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়, ঘোলা স্রোত টানে
যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে
গতির প্রবাহ হানে। মাটির কলসে জল ভরে
ঘরে ফিরে সলিমের বউ তার ভিজে দুটি পায়।
অদূরের বিল থেকে পানকৌড়ি, মাছরাঙা, বক
পাখায় জলের ফোঁটা ফেলে দিয়ে উড়ে যায় দূরে ;
জনপদে কি অধীর কোলাহল মায়াবী এ নদী
এনেছে স্রোতের মতো, আমি তার খুঁজিনি কিছুই।

কিছুই খুঁজিনি আমি, যতবার এসেছি এ তীরে
নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে
নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক।
একটি কাশের ফুল তারপর আঙুলে আমার
ছিঁড়ে নিয়ে এই পথে হেঁটে চলে গেছি। শহরের
শেষ প্রান্তে যেখানে আমার ঘর, নরম বিছানা,
সেখানে রেখেছি দেহ। অবসাদে ঘুম নেমে এলে
আবার দেখেছি সেই ঝিকিমিকি শবরী তিতাস
কি গভীর জলধারা ছড়ালো সে হৃদয়ে আমার।
সোনার বৈঠার ঘায়ে পবনের নাও যেন আমি
বেয়ে নিয়ে চলি একা অলৌকিক যৌবনের দেশে।

মায়াবৃক্ষ

এতোদিন জল ঢেলেছি যার
গোড়ায়, এখন দেখি যে তার
পোকায় কেটেছে শিকড় সব ;
অকালে শাখার পাতার স্তব
শুকাবে, এখন ভেবেই তল
পাইনে, বিফল করেছি কি
কোথায় ঢেলেছি পরম জল ?
হৃদয় নিঙড়ে লাল তরল,
ভাবছি এবার ছড়িয়ে দিই
শরীর, মাংস চর্বি বল !

হায়রে এমন মোহিনী ছল
ছলবে আমাকে জানতো কেউ ?
দু'চোখে এমন করুণ ঢল
বহাবে জানলে আনতো কেউ
দানবপুরীর সোনালি মূল ?

তখন ভেবেছি সোনার গাছ
একদিন দেবে হীরের ফুল,
একদা মরমী হাওয়ার আঁচ
দোলাবে এ গাছে মুক্তো ফল,
আজ চেয়ে দেখি ভিজিয়ে ভুল
অফলার মূলে ঢেলেছি জল !

অহোরাত্র

বুকে যদি হাত রাখো, শুনতে পাবে কল কল বাজে
বাঁচার অমোঘ শব্দ অবিরাম জীবনী-দোলকে,
একটু বিরাম নেই, সংসারের ব্যস্ততায়, কাজে,
কেবলই রক্তের ধ্বনি বোল তোলে পাখির পুলকে ;
যেন নদী বয়ে যায় অন্ধকার পাহাড়ের তলে
অন্তঃশীল কলরোল কোনোদিন শোনোনি তো কানে,
রক্ততীর্থ হৃৎপিন্ড অহোরাত্র কী মন্ত্র বাখানে ?
বাসনার লতাগুল্ম ছিঁড়ে যায় ইচ্ছার কবলে !

জরির শাড়িটা পরো, রঙ মাখো, আঁচড়াও চুল
আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখো বুকের গঠন
লুকানো যায় না তবু অনিবার্য যৌবনের ফুল
প্রতীকের মত যেন জেগে থাকে তোমার জঘন।
বুকে যদি হাত রাখো শুনতে পাবে ভেঙে দুই কূল
তোমার আয়ুর নদী পার হয় সোনার তোরণ।

বালেশ্বরে

কাজের উল্লাসে দিন কেটে যায় উদ্দাম পেশীতে
যন্ত্রের সমিল শব্দে তোমাকে মনুছোঁছি, প্রিয়তমা,
বাতাসে নিজেকে বাঁধি, ঘামে ভিজে, কেঁপে উঠি শীতে
আমাদের শ্রম যেন আনন্দের সরল উপমা।

নিঃশব্দে যন্ত্রণা সয় তিতাসের বুকচেরা পানি
যখন এগোতে থাকে অতিকায় লোহার কাছিম ;
ময়লা দু'হাতে ধরে কত শক্তি, বোঝে না সুখানি
ধাতব কোদাল শুধু টানে, ছেঁড়ে, জলের জাজিম।

অবাধ্য স্রোতের গতি তবু আনে বিরোধী জোয়ার
গেজের অন্তিম দাগে কাঁপে নীল তরল আঙুল,
আদিম ড্রাগন যেন ড্রেজারের উঁচু করা ঘাড়,
প্রাণের দুরত্বে ঘোরে নৌকোগুলো স্রোতের পুতুল।

দারুণ আক্রোশে ফোলে দানবের কাদাভরা পেট
তিতাসে ড্রেজার যেন ভাসমান লোহার সনেট।

ব্রে

নাদিরাকে

যখন জীবনে শুধু অর্থহীন লাল হরতন
একে একে জমা হলো, বলো একি অসম্ভব বোঝা
মুক্ত হয়ে হাঁটবার বন্ধ হলো সব পথ খোঁজা
এদিকে তুমিও এলে ইশকার বিবির মতন।

তুমিই এনেছো ডেকে এতসব বারোয়ারী পাপ
আমার মগজ যেন একাকার একতাল ছাই
দুচোখে ধুলোর ধাঁধা, ভাবি আজ কোথায় দাঁড়াই ?
কেমন বিষাক্ত লাগে, যেন দুটি লিকলিকে সাপ
নিজেদের গর্ত ভেবে ঢুকে গেছে আমার নাভীতে ;
বিষাক্ত ছোবল তার দিনরাত বাসনার ভিতে
অবিরাম ঠুকে ঠুকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এলিয়ে।

এতদিন ভেবেছিতো বন্ধুদের চোখে ধুলো দিয়ে
অপদেবতার নামে ছুঁড়ে দেবো যত হরতন,
তখুনি বাঁধলে তুমি ইশকার বিবির মতন
কি ভীষণ অক্টোপাশে মনে হয় গিয়েছি জড়িয়ে।

কঠিন সংসারে

যদিও পুরানো দৃশ্য, আঙিনায় অই
অবাধ্য গাছের মাথা ; নীচু ডালে ঘুমন্ত পাখিটা
একা আমি এই নিয়ে আরেকটু তৃপ্ত হয়ে রই
লেখার টেবিলে। কার নিত্য নিমকের ছিটা
হাঁসের ডিমের পোচে। খাটে আলনায়
হাত দিয়ে ছুঁয়ে যেতে কী যে সুখ তার

নির্ভয়ে দুলছে সংসার।

জানালায় যতদূর খোলা
তারো দূরে চেয়ে থাকা যেন আনমনে,
কয়েকটি ভারী শব্দে কাটা-ছেঁড়া, দীপ্ত করে তোলা
পয়ারে কোনো ছত্র। আমাদের মিলিত জীবনে
এর বেশী কি ঘটবে, কি ঘটাতে পারি
দেয়ালের হুকে যার আওলানো শাড়ি
এখন বাতাসে দোলে, চুলে তার ফুল গুঁজে দিতে
মনের কি সায় আছে ?

তার চেয়ে নীরবে নিভৃতে
কাজের চেয়ারে মাথা রেখে
যারা কিছু অন্যমনে অন্যভাবে দেখে
স্টোভের উপরে রান্না, মাংসের বাসি-গন্ধে ভরা
স্বাভাবিক জীবন মহড়া।
আমিও তাদেরি মতো জীবনের ঢেউটুকু গুণে
কোনমতে লেহ্যপেয় নুনে
বেঁচে যেতে চাই ;

খাই-দাই পড়ি লিখি
হাই তুলি, আয়ু আর আয়েশ বাড়াই।

হয়তো বাঁচবো আরও বছর তিরিশ
এরি মধ্যে সময়ের বুকে ফুল তোলা
বুঝেছি অসাধ্য কাজ। অন্য কোনো খোলা
রাস্তায় হাঁটতে হবে। অন্তত যাতে
অনায়াসে মুখ তুলে দুয়েকটা ছোঁড়া যায় শিস্।

লোক-লোকান্তর

আমার চেতনা যেন একটি শাদা সত্যিকার পাখি
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে ;
মাথার ওপরে নীচে বনচারী বাতাসের তালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার। আর দু'টি চোখের কোটরে
কাটা সুপারির রঙ, পা সবুজ, নখ তীব্র লাল
যেন তার তন্ত্রে মন্ত্রে ভরে আছে চন্দনের ডাল
চোখ যে রাখতে নারি এত বন্য ঝোপের ওপরে।

তাকাতে পারি না আমি রূপে তার যেন এত ভয়
যখনি উজ্জ্বল হয় আমার এ চেতনার মণি,
মনে হয় কেটে যাবে, ছিঁড়ে যাবে সমস্ত বাঁধুনি
সংসার সমাজ ধর্ম তুচ্ছ হয়ে যাবে লোকালয়।
লোক থেকে লোকান্তরে আমি যেন স্তব্ধ হয়ে শুনি
আহত কবির গান। কবিতার আসন্ন বিজয়।

এমন তৃপ্তির

কি নিয়ে ঘর করবে ?   ফুটো হাঁড়ি ভাঙা চাল চুলো
শার্কিনিতে শাদা ভাত, একটি মাটির দীপ জেবলে
যার মুখ ভাল লাগে, যদি তার চোখ দেখে ভোলো ;
সে পুরুষ যে-ই হোক, সে যদি নিজেকে দেয় ঢেলে
আর সে আকাঙ্ক্ষা আনে, তৃপ্তি আনে, সান্ত্বনা, সন্তান
দিতে পারে তোমাকেও, তবে তার অভাবের ঘর
দীর্ণ করে গড়ে তোলো কোনো ভালোবাসার বাগান
তার দেহে দেহ রেখে একবার কাঁপো থরথর।

স্পর্ধিত রোমশ বুকে একেকটি চুম্বনের দাগ
কাঁপা ঠোঁটে এঁকে দাও।   ভাবুক সে ডাইনী, মায়াবী
স্তন ঠোঁট নখ হতে ঢেলে দাও নিজের পরাগ
বলো তারে, ওরে পশু, বল্ আর কতটুকু পাবি,
সবি তো দিলাম তুলে যা ছিলো এ দেহের ভূভাগ
তার বিনিময়ে করি মাঠ ঘর সন্তানের দাবী।

আশ্রয়

তারা কেউ আসেন না আমার এ গোপন চত্বরে
এখানে উষ্ণতা নাকি ভয়ানক, দাঁড়ানো যায় না ;
চামড়ায় ফোস্কা পড়ে, উদর শুকিয়ে যেতে চায়
হাত-পা কেমন করে, পুড়ে যায় কাঞ্জিভরমও ;
ততোধিক তেষ্টা পায়, প্রাণ জ্বলে—ব্যথায় হিক্কায়
কেঁপে ওঠে বক্ষদেশ ; কি বিপদ লজ্জাও পশে না
তারাতো অসুরী নন, কিন্তু এই রাক্ষস-নিবাসে
নিজের দুর্গন্ধ নাকি বড় বেশী নাকে এসে লাগে।

এই ভয়ে আসেন না এইখানে ভদ্রমহিলারা !

একজন থাকে, যাকে বহুদিন হাসতে দেখিনি
ভাত মাছ তুলে ধরে জ্বেলে দেয় ভাঙা বাতিদান ;
আমার রচনা হতে তেলেপোকা আরশোলার মল
রোজ ভোরে সাফ করে। আত্মহত্যা করি এই ভয়ে
লুকায় নিদ্রার বড়ি, দরকারি রজ্জু ফেলে দেয়।

রাস্তা

চণ্ডীপদ চক্রবর্তীকে

যদি যান,
কাউতলী রেলব্রীজ পেরুলেই দেখবেন
মানুষের সাধ্যমত
ঘরবাড়ী।
চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে
হাওয়া।
কিষাণের ললাটরেখার মতো নদী,
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।

দেখবেন, লাউয়ের মাচায় ঝোলে
সিক্তনীল শাড়ির নিশেন।
শুঁটকির গন্ধে পরিতৃপ্ত মাছির আওয়াজ।
দেখবেন ভাদুগড়ের শেষ প্রান্তে
এক নির্জন বাড়ীর উঠোনে ফুটে আছে
আমার মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাসবতী
একটি ম্লান দুঃখের করবী!

ফেরার সংগী

ঘাটে এসে আর পেলামনা খেয়া নৌকা
দু'জন আমরা ছিলাম ফেরার যাত্রী
আমার দু'হাতে নিষিদ্ধ ক'টি গ্রন্থ
সবে তো সন্ধ্যা, মনে হলো কত রাত্রি
ফেরার আশাও ছিলো না যে আর সত্য
কারণ সেটাই ছিলো নাকি শেষ নৌকা
আমার দু'হাতে নিষিদ্ধ ক'টি গ্রন্থ
তুমি উৎসুক ছাত্রী।

দেখবে না কেউ, এসো পার হই সাঁতরে
এতো ছোট নদী, মরবে না, এসো ঝাঁপ দি—
বলেছিলে তুমি আমার শরীর হাতড়ে
আমার তখন হলো না তেমন শক্তি।

যেন মনে হলো স্রোত যেন বড় শক্ত
মনে হলো যেন নদী নয় এ তো সর্প
কেন মনে হলো পানি নয় এ-যে রক্ত ;
এমন কেন যে ভুল হলো সেই রাত্রে
কিসের ওপর করেছিলে এতো নির্ভর ?
আমার তখন ভেঙে গেলো উঁচু দর্প
কোন্ বিশ্বাস রেখেছিলে এই পাত্রে ?

লোকালয়

জানি না আবার আমি নিরানন্দ উষ্ণ লোকালয়ে
সেই রুক্ষ্ম পথ ধরে নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে আজ
কার মুখ দেখবো প্রথম ? দেখার দারুণ ভয়ে
বহুকাল ঘরে ফেরা হয়নি আমার, কি-বা কাজ
ঘরে এসে, যেখানে দৃশ্যের ভারে চোখ মেলা দায়
অবিরাম অশ্রুজল কিম্বা আত্মহত্যার তরল
ফেনায়িত লাল রক্তে কাচের নিপান ভরে যায়
সে আবাসে ফিরে গিয়ে কার মুখে দেখবো অনল ?

একটু উত্তাপ নেই কারো মুখে, কোনো উচ্চারণ
পবিত্র করে না এই নির্বান্ধব প্রকোষ্ঠের কারা ?
অথচ ঘটবে কিছু, ঘটনার বিভিন্ন কারণ
উপস্থিত পড়ে আছে এলোমেলো ; শুধু নেই তারা
যাদের বিহনে এই অন্ধকার স্বরূপধারণ
করে আছে চরাচরে। ঘুরে ফেরে ভয়ের ছায়ারা।

নূহের প্রার্থনা

ভাসমান নূহ নবীর জাহাজ। ঈশ্বরের অলৌকিক আক্রোশ মহাপ্লাবনরূপে সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নহীন করে ফেলেছে। চারদিকে শুধু এক থৈ থৈ জলের রাজ্য। মাঝে মাঝে দেখা যায় জলের ওপর ইতস্তত ছড়ানো মানব-মানবীর বিকৃত মৃতদেহগুলো। শুধু এই জাহাজটিতেই প্রাণের সাড়া। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউগুলো জাহাজের গায়ে অবিশ্রান্তভাবে ভেঙে পড়ছে। দীর্ঘদিন ভাসমান অবস্থায় থাকার পর আজ হঠাৎ কয়েক-জন পুণ্যবান পুরুষ ও নারী সর্মাভব্যহারে নূহ একটি কপোত হাতে হাঁটু গেড়ে পাটাতনের ওপর বসলেন। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে পাখিটি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন।

নূহ ॥ তখন কেমন হবে, আবার যখন
তরল তিমির ছিঁড়ে ভাসবে এ পৃথিবী প্রথম ?
জলপাই পাতার ফাঁকে সেই আলো,
বালি আর ঘাসের নরম
উদ্ভাসিত হবে ফের পুণ্যবান পুরুষের চোখে
তখন কেমন হবে আমাদের রমণীরা সব ?
যখন আবার
শোনা যাবে ঘন্টাধ্বনি উটের গলায়
তখন কেমন হবে প্রভু
হনোকের অবাধ্য এ পৃথিবী পাতকী ?

আকাঙ্ক্ষার মতো সিক্ত মোহময় মাটিতে কি আমি
রাখবো প্রথমই পা ? অথবা যে প্রশংসার বাণী
আমরা ধারণ করি হৃদয়ের কোমল কৌটোয়
তার কোনো কলি
উচ্চারিত হবে এই অধমের নত মুখ থেকে ?
আদমের কালোত্তীর্ণ সেই পাপ যেন
হে প্রভু আবার কভু ছদ্মবেশী সাপের মতন
গোপন পিচ্ছিল পথে বেরিয়ে না আসে।

কপোতটি নূহের হাত থেকে ঝট্‌পট্‌ শব্দ করে আকাশের দিকে উড়ে গেলো। নূহের পাশ থেকে একজন পুণ্যবতী রমণী কথা কয়ে উঠলেন।

নারী ॥ ভেসে ভেসে তারপর একদিন দুরন্ত বাতাসে
যখন আবার পাবো পুরানো সে মাটির সুরভি
আনন্দে উল্লাসে আমি আমার সে পুরুষের হাতে
আঘাত ভোলানো চুমু এঁকে দেবো নীরব আবেগে।
প্রথম রাত্রিতে তার বীর্যবান সন্তানের বীজ
সযত্নে ধারণ করে আমি হবো ক্লান্ত ফলবতী।
আবার করাবো পান বুকের এ উৎস ধারা হতে
জারিত অমৃত রস। এতোদিন যৌবনের নামে
যা ছিলো সঞ্চিত এই সঞ্চারিত শরীরের কোষে।
হে নূহ সন্তান দেবো, আপনাকে পুত্র দেবো আমি।

নূহের পেছন থেকে একজন পুণ্যবান পুরুষ কথা বললেন।

পুরুষ ॥ পৃথিবীর চিহ্ন নিয়ে যদি ফেরে আশার কপোত
গভীর আদরে আমি তুলে নেবো ফসলের বীজ,
আল্লার আক্রোশ থেকে যা এনেছি বাঁচিয়ে যতনে
আবার বুনবো তা-ই পুণ্যসিক্ত নতুন মাটিতে।
তোমাকে জড়াবো বুকে হে প্রেয়সী, তোমাকে কেবল
রক্তের উত্তাপ দেবো, প্রেম দেবো, গান দেবো বেঁধে,
তোমাকে ফসল দেবো, গৃহ দেবো, তৃপ্তি দেবো, নারী।
আপনাকে শান্তি দেবো আর নূহ, শক্তি দেবো আমি।

পিপাসার মুখ

পরিচিত সমস্ত ছিদ্রে আমি কান পেতেছিলাম,
পাথরের সমস্ত ফাটলে ফাটলে যেমন
হাওয়া লাগলে সুন্দর গোঙানি ওঠে,
তেমনি আমার আত্মার শিলাময় জঙ্ঘায় গহ্বরে
আমি ছিলাম উৎকর্ণ প্রহরী।
শব্দের রণিত উপত্যকায়
আমি প্রত্যহ যে স্তোত্রে মোনাজাত করতাম
ঈশ্বর ঈশ্বর বলে,
সেই ধ্বনিপুঞ্জ দোজখের আওয়াজের মতো
খাঁখাঁ রবে বিদীর্ণ হয়েছে।

বহুবার উচ্চারিত কর্কশ চীৎকারের মতো
মনে হয় আমার, কথা।
নিরুত্তাপ গানের মতো, ধ্বনি।
নিষ্প্রভ শোকের মতো আমার, শব্দ।
নির্জন কষ্টের মতো, বাক্য। আর
কীটদষ্ট গ্রন্থের মতো আমার তনুতীর্থ,
আমার প্রাণপীঠ।
আমাকে দুঃখের চেয়ে নতুন কোনো দাহ কেউ
দিতে পারেনি।
আমাকে শোকের চেয়ে সত্য কেউ
বোঝাতে পারলো না। আর
কষ্টের চেয়ে কঠোর স্পর্শ কোনদিন
ছোঁবে না আমাকে।

হে মোহান্ত, তেমন কোনো শব্দ জানো কি
যার উচ্চারণকে মন্ত্র বলা যায় ?
হে মোয়াজ্জিন, তোমার আহ্বানকে
কী করে আজান বলো, যা এতো নির্দিষ্ট।

আর হে নাস্তিক
তোমার উচ্চকণ্ঠ উল্লাসকে কোন্ শর্তে আনন্দ বলো,
যা এতো দ্বিধান্বিত।
তাই আমি নাস্তিক নই।
বিশ্বাসী নই।

সতর্ক আত্মার ওপর কড়ির মতন
দুটি চোখ অনুভবের যাদু দিয়ে
পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছি।
নিসর্গের ফাঁকে ফাঁকে যখন বিষণ্ণ হাওয়ার রোদন
দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে, আমি সেই
ধ্বনির যাদুকর।
চিতল হরিণী তার দ্রুতগামী ক্লান্তির শেষ যামে
যখন প্রস্রবণে পিপাসায় মুখ নামায়,
আমি সেই জলপানশব্দের
শিকারী।

কাক ও কোকিল

একবার এক শহুরে কাকের দলে
মিশে গিয়েছিল গানের কোকিল পাখি,
মনে ছিলো তার কোনমতে কোনো ছলে
শেখা যায় যদি জীবিকার নানা ফাঁকি।

শুধু গান ছাড়া বুদ্ধির নানা খেলা
শিখবে সে এই চালাক কাকের ভিড়ে,
পার হয়ে মহানগরীর অবহেলা
কণ্ঠ সাধবে প্রভাতের বুক চিরে।

কিন্তু বাতাসে ফিরে এলো তার গান
জন জীবনের কোলাহলে ভয় পেয়ে
ধুলোয় হাওয়ায় কেবলি যে অপমান
কাকের কলহ আকাশের মন্দিরে।

কাকেরা যে তার বোঝে না গানের ভাষা
রুক্ষ পালকে তীব্র কন্ঠে হাসে,
গানের পাখির নিভে যায় কত আশা
সবুজ পাহাড়ে একদিন ফিরে আসে।

মহুয়ার গাছে দুঃখের নানা শ্লোক
তারপর থেকে শোনা যায় রোজ রোজ
কার সঙ্গীতে কাঁপে অরণ্যলোক
কোন্ পক্ষীর হৃদয়ের নির্যাসে।

নেশার সুরভি যেন

হৃদয়ের অন্তঃস্থলে মোহময় সুগন্ধ লুকিয়ে
গন্ধের উৎস খোঁজে ক্লান্ত হয়ে যেমন হরিণী
পর্বতের আশপাশে লতাগুল্মে পাথরে গুহায়
অনর্থক নাক ঘষে, যন্ত্রণায় তৃষ্ণায় অধীর
বাঘের হাতের নীচে অবহেলে যায় কতবার,
কতবার ফাঁকি দিয়ে তীক্ষ্ণ তীর, শিকারীর চোখ
অদৃষ্টের খেলায় এই চিত্রিত শরীর
কৌশলে বাঁচিয়ে রেখে ঘাসপাতা খায়।

তেমনি গন্ধের ফুল মনে হয় হৃদয়ে আমারো—
মায়াবী সুরভী হানে রক্তে রন্ধ্রে হরিণীর মতো
আর আমি ঘ্রাণ শুঁকি অন্ধকারে আলোয় বাতাসে
ঘাসে ও মাটিতে ঠিক বিকারের রোগীর মতন।

আমার সমস্ত রক্তে যেন কোনো হোমের আগুন
জ্বলে ওঠে দাউ দাউ সহ্য করি পবিত্র দাহন।
অথচ পাই না টের কই সেই স্বর্গীয় সুবাস
কোথায় মোহের পুষ্প গন্ধ হানে হৃদয়ে নিভৃতে ?

নিজের দিকে

আসলে তো আত্মাই সব
ঘুরে ফিরে কোনো গতি নেই,
একদিন ফিরে যেতে হয়
অবশেষে নিজের দিকেই।

আমিই আমার পরিণাম,
আমাদের মনের ভিতর
নীরবে যে প্ররোচনা দেয়
আসলে সে তেমনি ইতর।

দেহ নয়, মন নয় যদি—
বলো তবে কি বাজাতে চাও ?
রক্তকে কেবলই যে নাড়ে
আজ সেই আত্মাকে বাজাও !

আত্মাকেই বাজাতে বাজাতে
দেহ নয়, মনও নয়, আর—
দুঃখেরো অধিক যে সুর
তুলুক তা আঙুল তোমার।

এসোনা ব্যথার দিকে যাই
কোথায় সে পাপের মন্দির
যেইখানে ঈশ্বরের বুকে
ঠোক্‌রায় কষ্টের তিতির ?

যন্ত্রণার পাখিটি যেখানে
উদ্যত রেখেছে তার ঠোঁট,
আমরাও নিয়ে যাই চলো
হৃদয়ের রাজার মুকুট।

করতলে

কি আছে এই হাতের মধ্যে
কি আছে কও ঢাকা ?
বললে হেসে, কী আর হবে
মিথ্যে ঢেকে রাখা।

মুক্ত করে বুকের কাছে
তুলতে দু'টি কর,
হাসলে, আরে, কোথায় পেলে
স্বর্ণালী মাকড় !

কি আছে এই চোখের মধ্যে ?
ঢাকলাম নয়ান,
বললে হেসে, ওই দেখা যায়
কালো ভুরুর টান।

মুক্ত ক'রে চক্ষু দুটি
যেই ফেলি নিঃশ্বাস
পিছিয়ে গিয়ে বললে, একি,
শঙ্খিনী তিতাস !

বুকের মধ্যে হাত রেখেছি
বলো, কি ঢাকলাম ?
বললে হেসে, কি আর হবে
শঙ্খের বোতাম।

মুক্ত হলো বক্ষ হতে
শূন্য করপুট,
হাত বাড়িয়ে বললে, এ যে
আল্লার মুকুট।

অবুঝের সমীকরণ

কবিতা বোঝে না এই বাঙলার কেউ আর
দেশের অগণ্য চাষী, চাপরাশী
ডাক্তার উকিল মোক্তার
পুলিস দারোগা ছাত্র অধ্যাপক সব
কাব্যের ব্যাপারে নীরব !

স্মাগলার আলোচক সম্পাদক তরুণীর দল,
কবিতা বোঝে না কোনো সঙ
অভিনেত্রী নটীনারী নাটের মহল
কার মনে কতোটুকু রঙ ?
ও পাড়ার সুন্দরী রোজেনা
সারা অঙ্গে ঢেউ তার, তবু মেয়ে
কবিতা বোঝে না !

কবিতা বোঝে না আর বাঙলার বাঘ,
কুকুর বিড়াল কালো ছাগ
খরগোস গিরগিটি চতুর বানর,
চক্রদার যত অজগর !

কবিতা বোঝে না এই বাঙলার বনের হরিণী
জঙ্গলের পশু-পাশবিনী।
শকুনী গৃধিনী কাক শালিক চড়ুই
ঘরে ঘরে ছুঁচো আর উই ;
বাঙলার আকাশের যতেক খেচর
কবিতা বোঝে না তারা। কবিতা বোঝে না অই
বঙ্গোপসাগরের কতেক হাঙর !

ভেদাভেদ

বুঝবে কি তুমি জটিল খেলার মর্ম
কেন পেতে আছি কষ্টের শরশয্যা ?
ভুলে গিয়ে সৎ কবির ধর্মাধর্ম
কী যে পেতে চায় আমার মাংস মজ্জা।

যারা নেমেছিলো আধুনিকতার দ্বন্দ্বে
আজো বেঁচে আছে তাদেরি কতেক ভক্ত
কেবল কয়টি পদ্যের দুর্গন্ধে
অর্ধশতক করে যাবে উত্যক্ত।

পূর্ণ বোতলে রক্তেরি মতো আমরা
আধার পাল্টে চলেছি নতুনে উতরে
সভ্য স্বচ্ছ স্পর্শকাতর চামড়া
মুড়ে রেখে শুধু ভেদাভেদ গড়ি গোত্রে

তুমি কি বুঝবে তোমার কি সৌন্দর্যে
আমায় করেছে অকাট্য হীনমন্য
শত দুর্নাম বাধা পায় ধীর ধৈর্যে
শয়তানও বলে, সাবাস, ধন্য ধন্য।

অকথ্য অলীক

কে তুমি আসবে শোনো তাকে বলি, রক্তের মতন
খেলে তপ্ত ধুলোঝড় সারাদিন ধৈর্যের ওপর।
অকথ্য অলীক জল কানের পর্দায় থির থির
আশাকে বাজায়। শব্দ শুনে মনে হবে
বয়ে যাচ্ছে যেন নদী অদূরে কোথাও
আপন উল্লাসে নীল, তরল গন্ধের মতো
লোভীর জিহ্বার পাশ ঘেঁষে।

অথচ ধুলোর দৃশ্য ছাড়া অন্য কিছু প্রান্তরে নামে না।
আহত আত্মার মতো দুয়েকটা পাখি ওড়ে রৌদ্রের সুতোয়
বহুদূর বিস্তৃত আকাশে।

কে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমার বয়সী
হাওয়ায় নদীর গন্ধ পাওয়া যাবে, এমন আশায়
এ কোন্ শুষ্কতার গভীরে এসেছো ?
তাকাও, এখানে কারো মুখ নেই, দেহ নেই, সমস্ত কিছুই
নিষ্ফলা বালুতে বিলীন। ১৯৬২ টি উষ্ট্র যায়
শূন্যপিঠ নির্গন্ধ বালুতে
খৃষ্টের মৃত্যুর পর একে একে মন্থর নিয়মে।

শিল্পের ফলক

স্নেহের সরল দৃশ্য প্রত্যহ সে দ্যায় উপহার,
যেন শিশুর মুখে উবু হয়ে বুকের লেবাস
খুলে দিয়ে শুয়ে থাকা প্রতিদিন ; রক্তের আঘাত
গোপন ভঙ্গিতে তার মোহময় বংশপিপাসার
উত্তাল স্রোতের দিকে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতে চায়।
বলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে মুখ দ্যাখ, এই স্বচ্ছ
সজল স্ফটিকে ;
একটি নৌকা তোর দে ভাসিয়ে
অপার তরলে ;
পবন পালের নায়ে ভেসে যাও,
যাওরে প্রেমিক।......

সর্পবিতানের কোনো ফলবান বৃক্ষের শিকড়ে
খুলে দিয়ে দু'টি উষ্ণ উরুর সোপান
কষ্টের হারাম ফলে জ্ঞানের সুবাস
কে যেন শুঁকছে বসে সরল বিশ্বাসে ;
পবিত্র গ্রন্থের সেই গল্পের আঁধারে
ঢেকে আছে নগ্নযোনি
গহ্বরফলক।

আবার পুরানো দৃশ্যে ফিরে গিয়ে দেখি ঃ
সমস্ত বোতাম খোলা, শিশুর মুখের কাছে
ফলভারে সুঠাম কামনা। শিয়রে রেহেলে রাখা
আল্লার আদেশ।
বাতিদানে আচ্ছাদিত ময়ূরপুচ্ছের প্রায়
মোমের আগুন।

কাক

হে আমার প্রিয়, পরম চতুর পাখি,
তোর কণ্ঠেই শুনি সত্যের সুর,
এই উদ্দাম নগরের হাঁকাহাঁকি
আত্মায় তোর উত্তাল ভরপুর ;
বুঝি জীবিকার প্রতীক চিহ্ন ওড়ে,
কৃষ্ণে ধবলে সবল দু'খানি পাখা,
শব্দ তোমার নটীদের ঘুংগুরে
যেন নৃত্যের মুদ্রায় তাল রাখা !

তুমি দুপুরের, তুমি ধূসরের জয়,
গভীর শ্রমের আহার্যে বেঁচে থাকো,
মিষ্টি-মধুর কান্নাকে করে ক্ষয়
আরো নির্দয় নির্মম হয়ে ডাকো ;
কাকজ্যোছনায় সকালের ভুল করা
তাঁদেরই তো সাজে যাঁরা নির্দোষ কবি,
আর সব প্রাণ হতাশায় ম্লান মরা
শূন্য হৃদয় বধির প্রতিচ্ছবি।

ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ নীল,
আহা প্রেয়সীর ভুরুর মতন তুই !
চিবুকের পাশে যেন তার কালো তিল
তেমনি আকাশে উড়ন্ত দেখি, ওই।
কখনো ভেবেছি খোঁপা বাঁধা কুন্তল
ডানার প্রান্তে যখন চঞ্চু গুঁজে
ঘুমাও তখন মনে পড়ে সেই ছল,
যে-জন আমারে চিরকাল ভুল বোঝে।

তুমি নগরের উত্তম নাগরিক,
ধূর্ত চতুর খেলো বুদ্ধির খেলা
অগোছালো যেন বিমর্ষ বিটনিক্
কাটায় তিক্ত অসহ্য কালবেলা ;

চোখ দু'টি তোর যেন বীয়ারের ফোঁটা
বন্ধু কৃষ্ণ করুণ কালের কাক,
কখনো হাওয়ায়, কখনো শূন্যে ওঠা
রাস্তার শিশু চেয়ে থাকে নির্বাক।

ক্লান্তিতে প্রাণ ক্ষয় হয়ে গেলে, আমি
যখন ভাবছি বাঁচবো আবার কিসে ?
জীবন তো চাই দুর্দম দ্রুতগামী,
তখন তুমিই উড়ে এসো কার্নিশে,
শোনাও তোমার সাহসী কলস্বর
অথবা দড়িতে বসে থেকে আড়াআড়ি
উচ্চকণ্ঠে ফোটাও যে অক্ষর,
এতেই জীবন মনে হয় তরবারি।

এমন আশার

বিশ্বযুদ্ধ বাধবে না, এ আশ্বাসে কাটবে না ভয়,
তবুও তোমাকে নিয়ে অনায়াসে লিখে ফেলা যায়
হয়তো এমন পদ্য, যাতে এই বিষণ্ণ সময়
আমরা মাড়িয়ে গিয়ে চেয়ে দেখি অই বারান্দায়
ছেলেরা মার্বেল খেলে, কথা বলে পড়শী মেয়েরা
অক্লেশে হাওয়া আসে পার হয়ে মেহেদীর বেড়া,
স্তন টানা শেষ করে খোকনটা বেলুন ওড়ায়—
ওদিকে বেতারে শুনি টিটভের আকাশ বিজয়।

সবকিছু সাহসীর মতো, জীবনের তোলপাড়
চক্রাকার ছুঁয়ে আছে গতিমান বিশ্বের বলয় ;
প্রতিটি নিঃশ্বাসে আসে গন্ধটুকু যে ভালোবাসার
তারি মধ্যে ফুটে আছে বাঁচবার দৃঢ় বরাভয়,
বারবার ধুয়ে যায় গ্লানিটুকু সব হতাশার
সহজ খুশীর মধ্যে মনে হয়, ওটা কিছু নয়।

রক্তিম প্রস্তাব

গন্ধ তার ঘরময়
রাতের শোয়ার আগে এখন সে দর্পণে নমিত,
মুক্ত করে বন্ধ বেণী।

কনুইয়ের কাছে অই বলয়িত
পাথরের সাপ,
বিচিত্র শঙ্খের খোল,
হিংস্রনখ পিতলের বাজ
তক্তপোষে হিম, মৃত। তবু এক দৃশ্যের প্রতাপ
দীপ্ত করে বাসস্থান ঃ
যেন কার রক্তের আওয়াজ।

রাতের আকাশে চাঁদ আহার্যের অভ্যস্ত টেবিলে
দুধের বাটির মতো ঈষদুষ্ণ, আর
একটু ছল্‌কে গেলে অন্ধকার
জল হয়ে যাবে ;
ঘোলাটে রঙের জিভ চেটে আরো নেবে তিলে তিলে
চৈনিক কালির মতো উপচানো
পিচ্ছিল আঁধার।

স্ত্রীলোকটি রাজী হবে এ রাতের যে কোন প্রস্তাবে।

দুরূহ আভাস

আর সে দুর্গম পথে দেখা গেলো প্রথম সওয়ার
আমাদের, অহঙ্কার বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়ে ঝরে
কেউ নেই, ছেলেগুলো পার হবে দুর্জয় পাহাড়
একটু করুণা ছিলো ঈশ্বরের নিষিদ্ধ অধরে ?
লোকালয়ে দেখিয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষের
অতি জীর্ণ ভাঙা এক জঙধরা ঋজু তরবারি
কেমন নরম ভাবে হাসে তারা, যেন সম্মুখের
উপত্যকা ভরে যাবে, টলে যাবে তীক্ষ্ণ পাহাড়-ই

আমরা সবাই মিলে গাইলাম অন্তিম কোরাস
যেন শেষ বিলাসিনী সম্রাজ্ঞীর কয়েকটি ছেলে
বাপের হারানো লিপ্সা বুকে নিয়ে হেসে অবহেলে
ঘোড়ার লেজের কাছে দাঁড়িয়েছে উঁচু করা বুকে—
তখনই আঁধার এসে হাত দিলো অই সব রাজার চিবুকে
পাহাড়টা মনে হলো যেন কার দুরূহ আভাস।

আমি

ফেরাতে পারি না মুখ যেই দিকে, সেই দিকে সে যে
মত্ত নৃত্যরতা, আর ব্যথিতার ভঙ্গি তুলে ধরে
আমার নিষিদ্ধ চোখ জেগে থাকে নিজের কোটরে
অথচ দেয় না দৃষ্টি। মরণের মধুর আমেজে
নাচের ঘুঙুর বাজে, মেঝে তার কাঁপে পদপাতে
প্রতিটি ধ্বনির তীর বিদ্ধ করে এই ভীরু বুক
কেউ যেন বলে ওঠে, এইবার ফেনিয়ে উঠুক
দুঃখ তোর, প্রেম কাম পিপাসার ইচ্ছার আঘাতে।

তবু কি যে নির্বিকার, অথচ ধার্মিক নই আমি
পৌঁছার আকাঙ্ক্ষা নেই কোনো সত্যে, কোনো দায়ভাগে,
ত্যাগেও অভ্যস্ত নই, কামনার কুলীন পরাগে
ফলাতে চাইনে কোনো মিথ্যে ফল। আমি কারো স্বামী
অথবা সন্তান নই, সাধারণ রাগে অনুরাগে
হয় না রক্তের গতি ধাবমান—আমি শুধু আমি।

চারজনের প্রেম

তোমার শব কাঁধে নিলাম আমরা চার জনে
একদা যার ভালোবাসার ভিখারী হয়ে বারম্বার
চার রকম চারটি হাত হেনেছি প্রাঙ্গণে।
বিদ্বেষের অন্ধকারে করেছি হানাহানি
নিজের কাছে অন্ধ ছিল নিজেরি শয়তানি।
আজকে দেখি সবার লোভ কোথায় যেন দিয়েছে ডুব
চার জনের চোখের কোণে সহজ শাদা জল
সেদিন থেকে তৈরি হল ভালোবাসার দল।

চারজনের বুকের কাছে প্রিয়তমার লাশ
কালো করুণ-কাফন ঢাকা চোখে গভীর সুর্মা মাখা
স্তনের কাছে এলিয়ে থাকা কালো চুলের রাশ।
শেষ হাসিটি লেপ্টে আছে মৃত নারীর ঠোঁটে
চার জনের দুঃখ যেন গন্ধ হয়ে ওঠে।
চারজনের রক্ত বুঝি এক হতে চায় সোজাসুজি
স্তব্ধ বুকে লুকিয়ে রেখে প্রিয় মুখের ছবি
এই ভূগোলে আমরা প্রথম ভালোবাসার কবি।

চার হাতের কোদাল দিয়ে কবর হলো খোলা
হলুদ-লাল ফুলের মাঝে দাফন হলে রাণীর সাজে
চার চোখের কেবল জলে দৃষ্টি হলো ঘোলা।
কালো মাটির একটু নীচে হারিয়ে গেলো দেহ
আমার কাছে লজ্জা পেলো আমারি সন্দেহ।
বিষাদ তার মুখের রেখা মনের মধ্যে হলো লেখা
দেহের গূঢ় অন্ধকারে রক্ত হলো ফেনা
চারটি লোকে গঠন হলো ভালোবাসার সেনা।

নৌকোয়

কখন ভেসেছি জলে, গন্তব্য যে আরো কতদূর
সে শুধু মাঝিই বোঝে, এ সবুজ জলের নূপুর
আমার নৌকোয় বাজে সারাদিন একি রিমঝিম,
কার হাত ভাসিয়েছে ক্লান্ত জলে আদিম পিদিম ?
সে সাত সকালে চড়া, এখনতো মুছে গেছে রোদ
সারারাত যাবো কেটে ছলছল জলের বিরোধ।

মোড়টা পেরিয়ে গিয়ে তুলে দেয়া হবে লাল পাল
ঢেউ ছিঁড়ে ছুটে যাবো, নৌকো হবে গতিতে মাতাল ;
বাতাসে ঘুমের গন্ধে চোখ দুটি যদি ভরে আসে
তখন মাঝির গানে কে কাঁদবে তরল তিতাসে।
তার চেয়ে ঘুম দিই, শুয়ে শুনি বইঠার ধ্বনি
নৌকো শুধু কেঁপে কেঁপে পার হোক জলের বাঁধুনি।

গোঁসাইপুরের ঘাটে হয়তো বা ভোর হবে কাল,
কারুকর্মী মহাকাল আঁকবেন সবুজ সকাল।

শোকের লোবান

আমার ক্ষমতা নেই, আমি পারবো না ; নারী
তুমি আর এসো না এখানে। নিজের দৈন্যের কথা
কতবার বলেছি তোমাকে। মহৎ শিল্পীর কাছে যাও ;
হয়তো পাথরে তিনি ফেটাবেন, তেমন গরিমা। হয়তো বা
রঙের তুলিতে আঁকা অসাধ্য হবে না।
তারা সবি পারে, তারা
সহজ সাহসে সবি সাধনায় বশ করে নেয়
সহাস্য বদনে। তেমন সহজ কিছু
কবিরা পারে না।

অক্ষরে বিম্বিত হতে চাও যদি, খুলে ধরো সমস্ত গোপন।
কথা বলো, দুঃখের সুরভি যেন ঝরে যায়। যেন,
জ্বলে যায় শবাধারে শোকের লোবান।
নগ্ন হও, শিশু যেন দ্যাখোনি পোশাক।
ভালোবাসো, তামসিক কামকলা শিখে এলে
যেন এক অক্ষয় যুবতী।

তখন কবিতা লেখা হতে পারে একটি কেবল,
যেন রমণে কম্পিতা কোনো কুমারীর
নিম্ননাভিমূল।

রূপোর রেকাবী

কখনো আকাশ হয় রক্ষ্মনীল তৃষ্ণার প্রকাশ
মোহময় শূন্যতায় বিদেহীর আত্মা যেন ওড়ে,
অপরূপ যন্ত্রণায় মরে যায় উদার বাতাস
ঈশ্বরের অনুভূতি হৃদযন্ত্রে অনর্থক ঘোরে !

আমারো হৃদয় হয় শূন্য এক রূপোর রেকাবী,
কামনার পদ্ম হয়ে আকাঙ্ক্ষার রক্তে থাকে ভেসে,
কে আর মিটাতে পারে এই রাজভিখারীর দাবী ?
রূপোর সে পাত্রটিও একদিন ডুবে যায় শেষে !

রক্তের অতল হতে অবশেষে ঈশ্বর নিজেই
তোলেন সে পাত্রখানি, নিয়ে যান অদৃশ্য তফাতে।
মায়াবী রুমালে মুছে বারবার নিজের হাতেই
বাজান সে পাত্রটিকে, আঙুলের অস্পষ্ট আঘাতে।

কখন যে অশ্রু নামে বিধাতার চোখ হতে, হায়
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে আমার সে রূপোর বাটিতে !
স্বর্গীয় কান্না সেই ঝরে যায়, পার্থিব হাওয়ায়
মানুষের ধর্মেকর্মে, অন্ধকারে, আলোয়, মাটিতে।

রাক্ষসোপচার

কাল এই নগরীর মুক্তপাট গ্রন্থের দোকানে
ঝোলানো দেখবে এই উষ্ণ হৃৎপিন্ডের মোড়ক ;
ঠোকরানো আত্মা সেই কাচ আর কাঠের ফোকরে
শীতল আলোর পাশে প্রদর্শিত হবে ঠিক পণ্যের প্রথায়
কসাইখানায় যেন ঝুলে আছে একখন্ড সদ্যকাটা সন্ধ্যার জবাই
লেপ্টানো মাংস আর বিবর্ণ কলজের কাতারে
টাঙানো থাকবে এই দীপ্ত লাল হালাল বিষয়
সূক্ষ্ম ছুরিতে ছিন্ন গোপন কোষের রক্ত
হয়তো বা তখনও লাফাবে।

সন্ধ্যার আলোর নীচে চর্বিলোভী মানুষের চোখ
হঠাৎ ভিড়বে এসে ; সাদামাটা মাংসের ক্রেতারা
একখন্ড বাসি গোশ্‌ত হাতে তুলে ঠোঁট চেটে ফিরবে গলিতে।
আর বলো কার চোখে পড়বে এই অতি লাল পিন্ডের প্রসাদ ?

কখন আসবে সেই অপ্রার্থিত অকপট মাতাল রাক্ষস
নির্মম লোভ যার ঝরে পড়বে চর্বিহীন বক্ষের ফসলে ?
উদার পকেট হতে কড়ি খুলে গুণবে আঙুল
রাতের পানের পর সামান্য লেহ্য ভেবে
আমার হৃদয় নিয়ে ফিরে যাবে নিজের নির্জনে।

স্মরণ

মনে আছে নাকি নিষিদ্ধ সেই
রাতের গূঢ়
আকাশের দিকে ইঙ্গিত তুলে
মেঘের ফাঁকে
বলেছিলে, ঐ ঈশ্বর দ্যাখো
অশ্বারূঢ় ;
পুঞ্জমেঘের স্বর্গীয় এক স্পষ্টতাকে !

সঙ্গমসুখী রাতের পাখিরা
শব্দ করে
আমাদের প্রতি জানালো তাদের
অবোধ ঘৃণা ;
তুমিও বুকের বোতাম বাঁধন
আলগা করে
বললে নীরবে, আমাকেও করো
লজ্জাহীনা।

কালের কলস

জল দেখে ভয় লাগে

আমরা যেখানে যাবো শুনেছি সেখানে নাকি নেই
বাঁচার মতন জল, জলস্রোত, বর্ষণ হবে না
নি-পাখি ভীষণ নীল দগ্ধদেশে উদ্ভিদহীনতা
হা হা করে দিনমান। বাতাসের বিলাসী বিরোধে
বিহঙ্গ বিব্রত হয়, সূর্য থাকে সর্বদা মাথায়
নিঃশব্দে চলতে হয় রুদ্ধশ্বাসে, অসহ্য গরম
ভেদ করে অন্ত্রনালী, গাত্রবর্ণ কালো হয়ে যায়,
জ্বরের লক্ষণ প্রায় ফুটে ওঠে সর্বাঙ্গে তখন।

আমরা ক'জন এই সমান বয়েসী সহোদর
যাইনি নদীর পথে জল দেখে লাগে বলে
তরলে তর্পণহীন চিরদিন তৃষ্ণার্ত থেকেছি।
তরণী বোঝাই তাই নিলেন না গম্ভীর পাটুনী
শস্যের উদ্বৃত্ত আঁটি পড়ে আছি ডাঙার ওপর।

আমরা প্রতীকহীন হাতে কোন পতাকা নিইনি।
আমাদের সঙ্গে এক বাউলের বিধবা যাবেন
উষ্ণ বয়সিনী এই বঙ্গ নাম্নী বৈষ্ণবীটি ছাড়া
তৃষ্ণার রাস্তায় আর অন্য কোন যুবতী যাবে না।

জলছবি

দর্পণের কাছে আর কোনদিন নির্বিষ্ট হয়ো না
মসৃণ এ প্রতিবম্ব বড়বেশী সত্যভাষী হয়।
লুকানো বয়স যেন ধরা পড়ে, ধরা পড়ে যায়
সহসা সাজানো রেখা তুঙ্গ করা তোমার মাধুরী।
আমরা যা ধরে রাখি সোজা করে রাখি যে সুষমা
রেশমী ফিতেয় বেঁধে, দৃঢ় হস্তে, স্পঞ্জে, কর্সেটে
বাঁধন না থাকলে যা একটুখানি দাঁড়াতে জানেনা
সারি সারি ঠেস দেয়া কাঠামোর অর্পিত আদল
যতই কোমল ভাবো, আসলে ভাস্কর জানে তার
চিহ্নের আড়ালে আছে একখন্ড গরীব পাথর ;—
কুটিল কৌশলে শুধু শিল্পী থাকে পটের আড়ালে
অর্থাৎ সমস্ত বুঝি গরিমার গোপনে গর্হিত
প্রবল ইচ্ছায় শুধু ধরে রাখা কদর্য দুষ্কৃতি !

যেও না জলের কাছে, যে সব নদীতে ঢেউ নেই
কাঁপেনা পানির প্রান্ত তেমন তিতাসে যাও যদি
সে যে আরও ভয়াবহ, আর্শি যেন তরল ত্রিশিরা
ফোটাবে কলস কাঁখে অতি মৃদু কম্পিত তোমাকে !

কেমন শীতল লাগে নীলাম্বরী জলে ভিজে যায় !
যেন কার বউ তুমি পড়ন্ত বয়সী মাতা যেন
ধুলোর খেলায় লিপ্ত নগ্ন দু'টি অবোধ শিশুর
অথবা ফিরতে হবে ঘড়া নিয়ে ভাদুগড় গাঁর
তারিক মীরের এক খড়ে ছাওয়া স্বপ্নের গহ্বরে।
যেমন ধবলী ফেরে পরিতৃপ্ত সন্ধ্যায় গোয়ালে
কিম্বা হুঁকোর কড়া খক খক কাশির গমক
পানির প্রভাবে যদি বেজে ওঠে কি হবে তখন ?

তাই বলি, ঢেউ তোলো, কলস ডুবিয়ে দাও জলে
ভেঙে দাও সব রেখা, প্রতারক পানির প্রভাবে
মুহূর্তে যা সত্য বলে অতিশয় প্রতিভাত হলে
তোমার শরীর কাঁপে অবয়ব দৃঢ়তা হারায়—
কাজল ভিজিয়ে নামে কালিময় নয়নের নদী
রোদনরেখার নামে ডাকে যারে গ্রামের মেয়েরা।

সত্যের আঙুল

সম্প্রতি সঙ্গীতে আমি আর কোন আনন্দ পাই না।
নিরানন্দ রাত্রে তাই মাঝে মধ্যে কৈশোরের কথা মনে হলে
মনে পড়ে সেই বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই দেবতুল্য পুরুষের মুখ
স্পন্দিত আঙুল তার অবিরাম নেড়ে যেত সরোদের আচ্ছন্ন শরীর
কান্নার চেয়েও দ্রুত দুঃখ যেন গলে যায় নিমীলিত নয়নে গভীর।

একবার দেবতার পদতলে বসে আমি
মানুষের অন্যতম ঝঙকার শুনেছি।
শুনেছি দুঃখ দাহ প্রেম পাপ প্রার্থনার চেয়ে শান্ত শব্দ করে উঠে
কেমন সরল ভাবে মানব ভাষার সব আরাধনা
তুচ্ছ করে দেয়।

কে যেন লুকায় মুখ...কে যেন বোরখা খুলে সহজে দেখতে চায়
আল্লার আরশ
...কে শিশু আব্দার করে ঐ যে বাজছে মাগো খেলনাটা দে মা...
তন্ময় পাদ্রী সে-ও সিগ্রেটে পুড়িয়ে ফেলে নিজের আঙুল...
তবলে অদৃশ্য টোকা রেখে কেউ বলে আস্তে, অতদূর পারি না ওস্তাদ

এখন সঙ্গীতে যেন আর সেই লাবণ্য ঝরে না।

আমি মানুষের হাতে শুধু সূক্ষ্ম কটি আঙুল খুঁজেছি :
খুঁজেছি কণ্ঠের কান্তি করুণার মতন কোথাও।
কিন্তু যত হাত ধরি, ধরে থাকি যে কয়টি সত্যের আঙুলে
বড় ঠাণ্ডা লাগে সব। অনড় আড়ষ্ট কটি সীসের শলাকা
অবনত করে রাখে সমস্ত তারের তৃপ্ত শব্দের তড়িৎ।

নির্ঝর সমুদ্র পাখি পর্বত ও প্রকৃতির কাছে
আমি যতবার যাই

দেখি, অর্থহীনতার এক সুন্দর আওয়াজ থেকে কেউ
সরায় নির্ভার হাত। চিহ্নহীন চাকিতে মিলায়
আলোকিত করাঙ্গুলি কার ? ধাবমান ধ্বনির ধৈবতে
নিঃসঙ্গ খুঁজতে থাকি বাহু তাঁর—অঙ্গুলি তাঁহার।

ফেরার পিপাসা

ফিরে যেতে সাধ জাগে, যেন ফিরে যাওয়ার পিপাসা
জাগায় সুদূর স্মৃতি ঃ মায়ের আঁচল ধরে টেনে
দেখায় দূরের নদী, ওইতো হাটের নাও মাগো
দখিনা বাতাসে দ্যাখ ভেসে গেলো সমস্ত সোয়ারী ;
হরিণবেড়ের মাঠে পৌঁছে যাব সন্ধ্যার আগেই
এ বেলা ভাসালে নাও রাত অত আঁধার হবে না
আকাশের দিকে দ্যাখ্, কোথায় ঝড়ের দাগ বল ?
মিছেমিছি ভয় পাস অনর্থক অশুভ ভাবিস।

বাপের কবরে গিয়ে মোম জেবলে কাঁদলে তখন
আমি কি বলবো কিছু ? না মা আমি জোনাক পোকায়
আঁঠালো লতায় বেঁধে মালা করে পরবো সুন্দর।
আমি তোর মোট নেবো, তোরঙ্গটা দিস মা আমাকে
হেঁটে হেঁটে পা ফাটালে চটি তোর নিজেই বইবো।
নে তোর পানের বাটা, বোরখা নে গো, মামানীকে বল—
তাহলে এবার আসি দুঃখীদের সংবাদ নিও গো।

বত্রিশ সায়েদাবাদ ঢাকা—এই বিষণ্ণ দালানে
তেমন জানালা কই ? যাতে বাঁকা নদী দেখা যায়
ধবল পালের বুক যেন মার বক্ষের উপমা,
কোথায় সলিলে ভাসে জোয়ারের তাবৎ নায়রী,
দেয়ালের ফ্রেমে রাখা কে দুঃখিনী জলের জলুস
পাথর ফাটানো সান্ত্বনার শব্দের মতন
তুমি কি জননী সেই, অভাবের আভায় দলিত
বাঙলার মানচিত্র এ ঘরের পেরেকে রয়েছো ?

স্বপ্নের আঘাতে আমি সারারাত ঘুমাতে পারি না
অথচ বালককালে মা আমার দক্ষিণ বাজুতে
রুপোর মাদুলী তুই বেঁধেছিলি স্বপ্ন না দেখার,
তবু কেন জননী গো খোয়াবের অসুখ সারে না !
সামান্য আবেশ এলে ভেসে যাই নুহের নৌকায়
অথবা উড়াল দিই আশার পাখিটি একা একা

প্রবল হাওয়ার মধ্যে আদিগন্ত শোকের কিনারে
নিঃশব্দে উড়তে থাকি ঢেউয়ে ঢেউয়ে, যদি কোনদিন,
আদিম উদ্ভিদ রেখা দেখা দেয়—কোমল কৌশিক
দারুণ বালুর বেগ, দিগ্বিজয়ী মাটির মহিমা।

রক্তের দিকে

মিথ্যায় প্রসন্ন হলে, বলতাম, দেখেছি আমিও
সে অক্ষয় উজ্জ্বলতা, অলৌকিক স্পর্শের অতীত ;
অইতো মহান তিনি, নিরুপম, পরম সুন্দর
আমার সম্মুখে অই অবিশ্বাস্য তৃষ্ণাতাপহীন
বর্ণহীন নির্বিরোধ, বলতাম পেলাম প্রথম
অসাধ্য যা চিরকাল অগোচর অসহ্য গোপন
আমার অঙ্গনে একি আলোময় অকথ্য পুলক—
মিথ্যায় অভ্যস্ত হলে এই মত বলা কি যেত না ?

বুঝিবা অদৃশ্য ছাড়া কিছু নেই প্রত্যক্ষ গোচরে
অভয়ের মতো আমি মুখচ্ছবি দেখিনি অন্তত
কৃপাহীন দীর্ঘশ্বাস আদিগন্ত শূন্যতা ব্যাদান
করে আছে চিরকাল, আয়ুষ্কাল গ্রাস করে আছে
একটি অমোঘ প্রশ্ন, যেন কার অব্যর্থ শায়ক
ছুঁড়েছে রক্তের দিকে লক্ষ্য মাত্র আমার শরীর।

সরল খিক্কার

পক্ষীকুলে জন্মে ওরে, তুই শুধু উড়াল শিখলি না।
এগারো বছর পর দেখা হলে নগরের রাস্তায় সেদিন
বললেন আমাদের পাড়াগাঁর ঘনশ্যাম পণ্ডিত মশায়।

এখনো স্মরণ হয়, ঈগলস্বভাব তোর পূর্বপুরুষেরা
ইচ্ছার সামগ্রী সব বিঁধে নিতো বিজয়ী নখরে
তাঁদের ওড়ার শব্দে ছিঁড়ে যেতো ভয়ংকর হাওয়ার খিক্কার
এবং এখনো দেখি কেউ কেউ, তোর সব বাল্যবান্ধবেরা
একে একে উঠে যাচ্ছে অভ্রভেদী অশথ চূড়ায়—
তুই শুধু পারলি না, গোত্রছাড়া নখদন্তহীন ;

ওরে, গগনভেরীর
বংশের গৌরব অই ঢেকেছিস বাদামী খদ্দরে ?

ঈগলের বাচ্চা হয়ে কোকিলের মতো চক্ষু তোর
কি করে রঙিন হলো, এখনো বুঝিনা।
এখনো বুঝিনা আমি
অনেক নখের লোভ ত্যাগ করে কোনো এক স্বর্ণশলাকায়
কখনো কি সময়ের বুকে গাঢ় ইচ্ছামতো চিহ্ন দেয়া যায় ?
এতেক বলার পর থামলেন আমার শিক্ষক সেই
রসিক ব্রাহ্মণ।

প্রশ্ন শুনে নত শিরে পদস্পর্শ করে বললাম—
সীতার উদ্ধারে ব্যর্থ, রাক্ষসের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন আমি
স্যার এক আহত জটায়ু।

ধৈর্য

ধৈর্য ধরে থেকেছি বহুকাল
খ্যাতির ধাপে উঠলো বুঝি পা,
ভিতর থেকে বিমুখ মহাকাল
বললো, নারে, এখনো নয়, না।

ধৈর্য ধরে থেকেছি বহুদিন
ভেবেছি এই বাজবে হাততালি ;
ধৈর্য শুধু বাজলো রিনরিন
ভুরুর নীচে জমালো ঝুলকালি।

ধৈর্য ধরে থেকেছি কত মাস
ওষ্ঠে বুঝি নামলো কারো ঠোঁট,
ধৈর্য কত কাঁপালো নিঃশ্বাস
ঠোঁটের কাছে রক্তমাখা চোট।

ধৈর্য নিয়ে কেটেছে কত রাত
আঙুল কেউ ঠুকবে জানালায়,
অন্ধকার করলো করাঘাত
অন্ধকারই টানলো বিছানায়।

ধৈর্য নিয়ে ভাবছি আজকাল
নামবো নাকি ধৈর্যহীনতায় ?
ধৈর্য যেন আমলকির ডাল
ঝড়ের তোড়ে কাঁপছে দীনতায়।

মাংসের গোলাপ

এখন তোরা তুঙ্গ করে তোল
ঊর্ধ্বে ধর মাংসের গোলাপ,
আঘাত থেকে আসবে ছেলেগুলো
নাভির নীচে উষ্ণ কালসাপ।

শীর্ণকায় দীর্ণ ছেলেগুলো
হাতড়াবে কি ঠান্ডা কার্পেট ?
ক্ষুধার কাছে ভালবাসার কাছে
বিছিয়ে দে লো সরল তলপেট।

উচে আজ পুচ্ছ তুলে দিয়ে
চিহ্নগুলো আলোর কাছে ধর,
রুগ্ন যেন রাস্তা খুঁজে পায়
শরীরে যার আদিম কালাজ্বর।

সিগ্রেটের অগ্নিমুখে যারা
ছিদ্র করে পণ্ডিতের লিপি,
পেন্সিলের শক্ত মুখ দিয়ে
উল্টে দেয় কনিয়াকের ছিপি ;

সূক্ষ্ম কোনো দুঃখ বোধ থেকে
আল্লা যার আত্মা গড়লেন
ক্ষুব্ধ সেই দুঃখী তরুণেরা
বিক্ষোভের আওয়াজ তুলছেন।

তাদের শয্যা ঝেড়ে, আজ
সাজিয়ে রাখ কৃষ্ণ কেশদাম,
গন্ধ আর ঘামের পরিণামে
ঢালুন তারা ক্লান্ত মহাকাম।

পাত্র আর মাটির ভাঁড় যত
সরিয়ে রাখ, বাঁচিয়ে রাখ দূর
মত্ত সব ক্ষত ও বিক্ষত
নষ্ট আর ভাঙার বাহাদুর।

আসবে ওরা ক্ষুধার কাছ থেকে
রক্ত চোখ ভক্ত ভাই সব,
কুত্তাদের আর্ত চীৎকারে,
শুনবো সেই দীপ্ত কলরব।

আমার সমস্ত গন্তব্যে

কোথাও যাব বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলাম।
জামা কাপড়গুলো অন্তত বন্ধুদের আড্ডায় যাওয়ার মতো
ফরশা করে কেচেছি। শুকনো পাঞ্জাবী থেকে
রৌদ্রের গন্ধ বেরুচ্ছে। পকেটে কিছু কাঁচা পয়সার আওয়াজ
আর ভাঁজ করা সদ্য লেখা পদ্যের সাথে
পাঁচটা কিংস্টর্ক।

এখন কোথায় যাওয়া যায় ?

শহীদ, এখন টেলিভিশনে। শামসুর রহমান
সম্পাদকীয় হয়ে গেলেন। হাসানের বঙ্গ জননীর নীলাম্বরী বোনা
আমার দ্বারা হবে না। জাফর ভাই, ঘোড়ার গায়ে হাত বুলান।
আরতি, খৃস্টান শিশুদের বাইবেল পড়ানোর দায় নিয়ে
পালালো। সেবু, ভারতে। প্রভু, প্রভু
এইতো আমার ভ্রাতৃত্বের রজ্জু, দয়াময়।

আমি সারা শহর একজন সুহৃদ খুঁজে বেড়াচ্ছি,
এখন আমার একজন বন্ধু দরকার,
আমার সমস্ত চেতনায় একটি কড়া নাড়ার আগ্রহ
একজন বন্ধুর মুখ দেখার বাসনা,
একটি স্বরচিত কবিতা শোনানোর নির্লজ্জতা
রক্তের শব্দের মতো বইতে লাগলো।

আমার একাকী আত্মার পেরেক বিদ্ধ ছিদ্র পথে
রক্তবমির মতো উগড়ে উঠলো একটি হিব্রু আর্তনাদ
'এলী, এলী, লামা সবক্তানী।'

আমার সমস্ত গন্তব্যে একটি একটি তালা ঝুলছে।

কালের কলস

অনিচ্ছায় কতকাল মেলে রাখি দৃশ্যপায়ী তৃষ্ণার লোচন
ক্লান্ত হয়ে আসে সব, নিসর্গও ঝরে যায় বহুদূর অতল আঁধারে
আর কি থাকলো তবে হে নীলিমা, হে অবগুণ্ঠন
আমার কাফন আমি চাদরের মতো পরে কতদিন আন্দোলিত হবো
কতকাল কতযুগ ধরে
দেখবো, দেখার ভারে বৃষের স্কন্ধের মতো নুয়ে আসে রাত্রির আকাশ ?
কে ধারাল বর্শা হেনে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করে সেই কৃষ্ণকায় ষাঁড়ের শরীরে
আর সে আঘাত থেকে কি-যে ঝরে পড়ে ঠিক এখনো বুঝি না
একি রক্ত, মেদ, অগ্নি কিম্বা শ্বেত আলো ঝরে যায়
অবিরাম অহোরাত্র প্রাণ আর কিমাকার ভূগোলে কেবলই—
ঝরে যায় ঝরে যেতে থাকে।
ক্রমে তাও শেষ হলে সে বন্য বৃষভ যেন গলে যায় নিসর্গশোভায়।
তুমি কি সোনার কুম্ভ ঠেলে দিয়ে দৃশ্যের আড়ালে দাঁড়াও
হে নীলিমা, হে অবগুণ্ঠন ?
আকাশে উবুড় হয়ে ভেসে যেতে থাকে এক আলোর কলস
অথচ দেখে না কেউ, ভাবে না কনককুম্ভ পান করে কালের জঠর ;
ভাবে না, কারণ তারা প্রতিটি প্রভাতে দেখে ভেসে ওঠে আরেক আধার
ছলকায়, ভেসে যায়, অবিশ্রাম ভেসে যেতে থাকে।

কেমন নিবন্ধ হয়ে থাকে তারা মৃত্তিকা সন্তান আর শস্যের ওপরে
পুরুষের কটিবন্ধ ধরে থাকে কত কোটি ভয়ার্ত যুবতী
ঢাউস উদরে তারা কেবলই কি পেতে চায় অনির্বাণ জন্মের আঘাত।
মাংসের খোড়ল থেকে একে একে উড়ে আসে আত্মার চড়ুই
সমস্ত ভূগোল দ্যাখো কি বিপন্ন শব্দে ভরে যায়
ভরে যায়, পূর্ণ হতে থাকে।
এ বিষন্ন বর্ণনায় আমি কি অন্তত একটি পংক্তিও হবো না
হে নীলিমা, হে অবগুণ্ঠন ?
লোকালয় থেকে দূরে, ধোঁয়া অগ্নি মশলার গন্ধ থেকে দূরে
এই দলকলসের ঝোপে আমার কাফন পরে আমি কতকাল
কাত হয়ে শুয়ে থেকে দেখে যাবো সোনার কলস আর বৃষের বিবাদ ?

অসুখে একজন

কাকটা তাড়িয়ে দাও, ও বড় ভীষণ কণ্ঠে ডাকে।
জানালাটা হাট করে কাছে এসে বসলে কি হয় ?
বললো সে ম্লান শব্দে সুন্দর উদর থেকে সরিয়ে ভরম ;

পিয়ালার মতো দুটি বক্ষপদ্মে উড়ে গেলো দৃষ্টির ভ্রমর

কাছে গিয়ে ডাকলাম।

কণ্ঠা উঁচু হয়ে আছে, গালে গর্ত, চোখ দু'টি স্থির।
এক পক্ষকাল ধরে বার বার ব্যথায় অষুধে
জানতে সে চেয়েছিলো আত্মহত্যা কি কারণে পাপ।
এইতো আশ্বিন আজ। একটুখানি আলো কিংবা বাতাস পেয়েই
সবুজ সম্ভ্রমটুকু টেনে ধরলো বুকের ওপর।

তোমাকেও ঘুমুতে দিইনি—ব্যথায় তরল হলো
মার্বেলের মতো দু'টি অতল পাথর
যেখানে বিস্মিত হয় ফুলদানী ভোজপত্র টেবিল প্রভৃতি।

কাল খুব জ্বালিয়েছি, তোমাকেও ঘুমুতে দিইনি
ভাবলাম বাঁচবো না কোনদিন দেখবো না তোমাকে
তোমার পড়ার শব্দ শুনবো না, কবিতার অস্পষ্ট আওয়াজ
ঘুরবে না ঘরময়, আমার চৌদিকে। বলবে না বান্ধবীরা
লো তোর কবির কান্ড পড়েছি কাগজে। কাল শুধু ভাবলাম
পার হয়ে যাচ্ছি যেন আমাকেই আমি—
আমাকেই আমি যেন পার হয়ে যাচ্ছি বহুদূর !
যেমন জোয়ার ঠেলে কম্পমান নৌকা ভেসে যায়
যেমন রাতের নদী ঢেউয়ে ঢেউয়ে টেনে নেয় কারো হাতে ভাসানো প্রদীপ
তেমনি আয়ুর রেখা তেমনি প্রেমের রেখা দুঃখের শোকের
সমস্ত ছকের খেলা পার হয়ে যাচ্ছি বহুদূর !

শরীর থেকে মা’র

পালাতে চাই, লুকাতে চাই চোখ
তোমার বুক তোমার কন্দরে
জাহাজ ভরা বয়েছি যত শোক
ভিড়াবো এই ক্ষুব্ধ বন্দরে।

স্বদেশভূমি, তুমি, তোমার নাম
শুনেছিলাম মাংস থেকে মা’র
ফাটিয়ে দিয়ে শহর ঘর গ্রাম
আমরা ক’টি পুত্র কানু পা’র।

শবরী পা’র চোখের মতো শ্যাম
গভীর ঘাসে রাখতে দাও মা
আমার নাম, আমার পরিণাম
ছিন্ন করে নিজেকে শতধা।

হতাশা কই ? হতাশ নইতো
হতাশা আজ বাতাসে মেলে ধরি
এখনও বয়. যেমন বইতো
গুপ্ত লাল তপ্ত নির্ঝরই।

বুকের কাছে

তোমায় নিয়ে আপন মনে খেলা
কখনো আমি খেলিনি, ভালবাসা
লক্ষ্যহারা রাজার মতো শেষে
ধরেছিলাম জীবনপণ পাশা।

রক্ত দিতে চেয়েছিলাম বলে
মোহিনী, তোর এমনি ছল যে,
সোনার থালে চাইলে টুকটুকে
টুকরো করা আমার কল্‌জে।

যখন আমি আর্তনাদ করি
বললে হেসে, এবার গান ধরো ;
কণ্ঠে যেই নিলাম সঙ্গীত,
বললে কেঁদে, আর্তনাদ করো।

কবে তোমার গোপন করতালি
বাজিয়েছিলে কুটিল করপুটে
আজও আমার স্বপ্নে, অবসরে
শব্দে তার তৃষ্ণা ফুটে ওঠে।

এখন আর কি আছে বাকী বলো ?
শূন্যহাত বুকের কাছে খোলা,
কঠোর শ্রমে জীবন ঘষে ঘষে
নগ্ন নিজ মূর্তি গড়ে তোলা।

বেহায়া সুর

তুমি আমার একটি থোকা কালো আঙুর
সারা শরীর জড়িয়ে আছি লতাগাছি,
তোমার দেহে মনে আমার বেহায়া সুর
আমি ভ্রমর, আমি তোমার কালো মাছি।

তুমি আমার তিতাস, কালো জলের ধারা
পানকৌড়ি আমি, আমি পানির ফেনা,
ডুব-সাঁতারে নিত্যকালের এই চেহারা
তুমি আমার কালো শালুক, চিরচেনা।

কালো মাটির কালো পুতুল তুমি আমার
সোঁদা মাটির গন্ধ হয়ে লুকোই গায়ে
আমি তোমার নীলাম্বরী শাড়ির দু'পাড়
বক্ষ ঘিরে জড়িয়ে থাকি লুটোই পায়ে।

তুমি আমার রাত্রি, আমার অমানিশা
আমি তোমার ছোট্ট কালো জোনাক পোকা,
এইতো আলো, এইতো কালো, নেই যে দিশা
আমি তোমার রুদ্ধদ্বারে একটি টোকা।

তুমি আমার অসুখ ঘরে বাসক পাতা
অসুস্থতার গন্ধমোছা ঘরের দাওয়া
তুমি আমার বর্ষাজলের সিক্ত ছাতা
উষ্ণ কোন গ্রীষ্মদিনের ঠাণ্ডা হাওয়া।

বসন্তের রাত

এলো ফিরে অন্ধকার যেন কোন অপদেবতার
মোহনী কুহকে ঢাকা পড়ে আছে আমার নিবাস,
গন্ধময় চারিদিক, জানিনা তো ছায়া পড়ে কার ?
বাসনার বেদীমূলে অপব্যয়ী কুসুমের মাস।

বাতায়নে দেখি চেয়ে, দেখা যায় মায়ার বিতান
ডাইনীরা খেলা করে নগ্ন ক্রোড়ে ফুলের স্তবক ;
যেন আজ লেখা যেত পৃথিবীর অন্যতম গান
পান করা যেত বুঝি তীক্ষ্নতম শব্দের আরক।

কিন্তু কি অবহেলায় কেটে যায় এ সমস্ত রাত
আমার আলস্যে ঝরে মন্ত্রপূত শিশিরের ফোঁটা ;
হৃদয়ের মহামণ্ড ভেঙে ফেলে গ্রীষ্মের আঘাত
নিজের আশ্রয় ছেড়ে এর বেশী যায় না তো ওঠা।

যৌবনে আরাধ্য কারা ?   অসতীরা, এইটুকু জানি
বক্ষের বাগানে ডাকে রক্তচক্ষু বিরক্ত কোকিল
কামুক অন্ধ আমরা স্বর্গ থেকে যতটুকু আনি
সবি যেন ভাঙাচুরা পরস্পর রয়েছে অমিল।

সবুজ পাতার

এখনো পূর্ণ করনি কিছুই কথা যা ছিল
সবি পড়ে আছে এলোমেলো আর অর্ধেক সব ;
গুচ্ছে গুচ্ছে মিল এসেছিলো অন্তর্মিলও
সবুজ পাতায় মেলেছিলো তার অবুঝ পরব।

কিছু তার তুমি মিলিয়েছো ঠিক, কিছুবা অমিল
বলেছিলে আর কথা বলবার শব্দ কোথায় !
আজো সে কথার গন্ধ তোমার করে ঝিলমিল
আরো কিছু কথা ঝুলে আছে দূরে শূন্য সুতায়।

সে কথকতার মেলাবার ভার তোমার ওপর
পাখির মতই হৃদয় খাঁচায় তুললো কূজন ;
তাকাওনি তুমি তপ্ত আকাশে তৃপ্ত দুপর
এসে চলে গেছে পায়নি তোমার মনের ওজন।

অবহেলা আর অবজ্ঞা নিয়ে কেটে গেছে কাল
মেলাওনি তার হৃদয়ের সেই আর্তির রব ;
মনের গুচ্ছে ঝুলে আছে কটি রঙিন মাকাল
আঙুরের মত শব্দগুলোই রয়েছে নীরব।

হে আচ্ছন্ন নগরী

আমিও যখন এসেছি নগরে একি !
তোমার শরীরে আভরণ নেই কোনো
পশুর থাবায় বিঁধে আছে চেয়ে দেখি,
নাভিমূল আর কামনার অঙ্গনও।

সবুজ শাড়িটি জীর্ণ মালার মতো
পড়ে আছে পায়ে নিটোল ঊরুর কাছে,
জীবন যেন বা হয়েছে কণ্ঠাগত
পাতা-ঝরা এক তরুণ সেগুন গাছে !

চারিদিকে কাঁপে দুঃখের হাহাকার
হৃদয় বিতানে শুকায় জীবন-লতা,
পাপ প্রাঙ্গণে বেঁধেছো কি সংসার
হাতে নিয়ে শুধু বয়সের পেলবতা ?

বাতাস কাঁপছে অসুস্থ আলোড়নে
পত্রে পুষ্পে স্পর্শ লেগেছে তার,
শতধা দীর্ণ আমার লাজুক মনে
হেনেছো তোমার হতাশার তলোয়ার।

কখন আমার ইচ্ছাকে মেলে ধরি
আশার কুসুম যখন পশুর হাতে ?
সুন্দরী, তুমি যত হও সুন্দরী
তোমাকে চাইনি মাতাল ঝড়ের রাতে !

জাপানী আড্ডা

নির্ভয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন যদি করা যেত তবে
বলতাম, হে ঈশ্বর আমাদের ওপরের ফ্লাটে
যে বৃদ্ধ জাপানী থাকে—এ দিকের বন্দর তল্লাটে
মহান সুনাম তার, সমুদ্রের কেচ্ছার গৌরবে
বাজারবিজয়ী ব্যক্তি। সদাহাস্য রঙিন পোশাকে
নোগুচির মতো লাগে। মদ-মাংসে সমান ভাপস !
তরুণ তিমির মতো সাগরের এ-উচ্ছলতাকে
কি ভাবে আয়ত্ত হলো নেই যার তেমন বয়স !

ছুটিবারে আসে তার দরিয়ার ইয়ারেরা সব
বুড়ো নাবিকের দল মাথা ভর্তি খাটো পাকা চুল
রেলিঙের কাছে বসে ক'টা তৃপ্ত সমুদ্র পাশব
বাণিজ্যের গল্প করে ; যেন স্প্রীংয়ে নিপ্পনী পুতুল
দম পেয়ে করে যায় আজে বাজে মিষ্টি কলরব,
জাহাজী ভাষায় আঁকে এশিয়ার বিচিত্র ভূগোল।

প্রত্যাবর্তন

আমরা কোথায় যাবো, কতদূর যেতে পারি আর
ওইতো সামনে নদী, ধানক্ষেত, পেছনে পাহাড়।
বাতাসে নুনের গন্ধ, পাখির পাঁপড়ি উড়ে যায়
দক্ষিণ আকাশ জুড়ে সিক্তডানা সহস্র জোড়ায় ;
তবে কি বৃষ্টির দেশে এসে গেছি আমরা তাহলে
তরঙ্গের মধ্যে শান্ত লোকালয়, খাল বিল জলে।
দুঃখের রাজত্বে তবে পলাতক আমরা ক'জন
আবার এসেছি ফিরে ; আমাদের ক্লান্তিহীন মন
একদিন জনপদ ছেড়ে এই ক্লান্ত কান্নাময়
পরিণাম চিন্তা করে দেশত্যাগী কবির হৃদয়
নিয়ে যেন পার হয়ে গিয়েছিলো নিজের এ কূল,
কিন্তু আজ মাছ পাখি নাও নদী মাটির পুতুল
বহমান মানুষের অনিবার্য প্রতীকের কাজে
আবার এসেছে ফিরে অনুতপ্ত, নিজের সমাজে।

দেখলো নতুনভাবে ফুলগাছে বসন্তের পাখি
লাফিয়ে বেড়ালো তার মিষ্টি শব্দে করে ডাকাডাকি।
নষ্ট একতারা নিয়ে মনে মনে গুন গুন গেয়ে
দেখলো যে কৃষ্ণচূড়া সবুজের অন্তরাল ছেয়ে
সমস্ত শক্তির মূল্যে জেবলে দিল ফুলের অনল ;
একটু বাতাসে কাঁপে ঝোপঝাড় পাখির মহল।

দ্যাখো, জয়নুলের ছবির মত ঘরবাড়ী, নারী
উঠোনে ঝাড়ছে ধান, ধানের ধুলোয় ম্লান শাড়ি :
গতর উদোম করে হাতে লেপা মাটির চত্বরে
লাঞ্ছিত নিশেন হয়ে পড়ে আছে যেন অনাদরে।
প্রাণের রঙের মত পরাজিত প্রেমের কেতন
আবার তুলতে চাই পলাতক আমরা ক'জন।

মানুষের বাসস্থান, লাউ মাচা, নীলাম্বরী নিয়ে
আমরা থাকতে চাই ;   এ হৃদয় যেন ঝিলকিয়ে
কখনো উঠতে চায়, আমাদের পূর্বপুরুষের
তাড়ির আসরে গিয়ে অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে নিজের
আদিম সাহসে বলে, আমাদের হাতে হাতে দিন
কর্পূর গন্ধের বিন্দু ফোঁটা ফোঁটা বাসনা রঙিন।

প্রথম বৃষ্টির

হঠাৎ শীতের শেষে ফাল্গুনের ফুটন্ত আকাশে
সাহসী দৈত্যের মত অভাবিত মেঘের আসর
জমলো এমন ভাবে, ভাবলাম বঙ্গোপসাগর
উদ্বৃত্ত জলের কণা পাঠিয়েছে আগেই এ মাসে।

এসেই নামলো তারা। আমাদের সামান্য শহর
আনন্দে উদ্বেল হলো, টেনে নিলো নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
প্রথম বৃষ্টির গন্ধ, প্রথম পানির ফোঁটা ঘাসে
লাগামাত্র মনে হলো অলৌকিক পাহাড় প্রান্তর।

কাঁপলো নদীর জল। ছাদের শুকোতে দেয়া শাড়ি
উড়ে গিয়ে কোথায় হারালো। উলঙ্গ ছেলের দল
পিচ্ছিল উঠোনে নেমে তোলপাড় করে দিয়ে জল
সারা দেহে কাদা লেপে চেঁচিয়ে করলো মারামারি।

অকস্মাৎ বৃষ্টি পেয়ে মত্ত হলো সমস্ত অঞ্চল
কড়ির খেলায় বসে মেয়েরাও জুড়লো কাড়াকাড়ি।

সাহসে আঘাতে স্পর্শে

যে আমি প্রায়ান্ধকার প্রত্যুষের দিকে
ভেবেছি করবো যাত্রা, নারী এসে এক
বললো, দাঁড়াও যাত্রী, অই সব ফিকে
বিবর্ণ আদর্শে গিয়ে নিজের বিবেক

পুড়িয়ে কি লাভ বলো ?   যতক্ষণ টিকে
থাকা যায় থাক তুমি।   নইলে আরেক
মরমী মদির চিত্র মৃৎপটে লিখে
নিয়ে যাও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বারেক।

আমার সৌন্দর্যে এসো।   শরীর জঘন
অসহ আগুনে নিত্য জ্বলে যেতে চায়
নটির মুদ্রার মত মন আর স্তন
অশ্লীল আরব্ধ বিষ তুলেছে ফণায় :

সাহসে আঘাতে স্পর্শে তোমার রমণ
শেষ করো।   ঘামে কামে পরিতৃপ্ততায়।

গ্রামে

আলো নামবে উড়াল দেবে পাখি
হাটের নাও লাগবে এসে ঘাটে,
একটি মুখ উদাস চোখ রাখি
ভাববে তার আরেক দিন কাটে।
একটি মুখ গরীব কালো চোখ
দেখবে মাটি ঢেউয়ের দাঁতে দাঁতে
ভাঙে, কেবল ভাঙে পানির রোখ্
ধানের মাথা ধরবে ডান হাতে।

আলো নামবে আঁধার কালো জল
ফুসবে কালো কারো চুলের মত,
ঘরে ফিরবে পাখির দঙ্গল
একজন সে থাকবে অন্তত।
শাপলা যেন বাতাসে উন্মুখ
চিবুক তার রাখবে ঠিক বামে,
অষুধে তার সারবে না অসুখ
নাও দেখলে দেহ ভিজবে ঘামে।

বধির টঙ্কার

সামান্য চৌকাঠ শুধু তুচ্ছ করে এসো এই ঘরে
বাসনার স্থিরমুদ্রা স্পর্শ যদি করে নাভিমূল ;
কী হবে শরীর ঢেকে, জানালার পাট বন্ধ করে ?
অপরাধী অন্ধকার যদি সেই ঢেউয়ের তুমুল

দোল আনে ; কান্তিময়ী নর্তকীর মতন সোহাগে
উদ্যত ফণার কাছে নিয়ে যায় ; বধির টঙ্কার
বেজে ওঠে সারা মর্মে ; নিমীলিত চোখে যদি জাগে
বেদেনীর বাণদৃষ্টি, এসো তবে যুবতী আমার।

হাতে চেপে শব্দময় পাতকিনী পায়ের নূপুর
তুমি কি থামাতে পারো ধাবমান ধ্বনির দাপট ?
মুদ্রিত আঙুলে তোলো যে ইঙ্গিত, সমস্ত কিছুর
অর্থ যেন ভেসে যায় জলবৎ, যেন ভরা ঘট

উল্টে গেছে অকস্মাৎ লাথি লেগে লোলুপ পশুর
অথবা প্রথম রক্ত ভিজিয়েছে কুমারীর গোপন সংকট।

আমার আগুন

সহজে দাঁড়াতে চাই অবনত সরল মস্তকে
গোলাব জলের ছিটা হয়ে যেতে বড়ই খায়েশ
কবির গ্রীবার মত যুক্তি থেকে ফুলের থালায়
কাত হয়ে থেকে যাব সর্বশেষ উৎসর্গ যেমন।

আমার নগ্নতা দেখে আত্মীয়রা বিমর্ষ যদিও,
পবিত্র ধোঁয়ার গন্ধ হয়ে যাচ্ছি—এমত আক্ষেপে
কে এক সুহৃদ কাল পাঁচ গজ খদ্দরের দাম
স্নেহসিক্ত বাক্যসহ ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলেন !

সমস্ত প্রত্যঙ্গ থেকে ঝরে যায় স্বস্তির চেতনা
পাপ-পুণ্য ভেদ ঘৃণা খসে পড়ে যায় নিরুপায় ;
তেমন শরম কই আতঙ্কিত যে অনাবরণ
হঠাৎ ঢাকবো বলে ধরে রাখি আমার কাপড় ?

আমাকে আসতে হবে অবনত বিনীত নিয়মে
আতরদানীর মত হয়ে যায় যেখানে হৃদয়
অথবা রেহেলে রাখা অনশ্বর অক্ষরের কাছে
কম্পিত মোমের মত জ্বালতে চাই আমার আগুন

পথের বর্ণনা

মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি ; সামনে দু'টি পথের বিস্তার
আপাতবিরোধী যেন ঊর্ধ্ববাহু মেলে আছে স্থির।
আমি কোন লক্ষ্যে যাবো, আমি কোন নির্দেশের দিকে
অতিরিক্ত একজন হেঁটে যাবো নিঃশঙ্কচরণ ?
এ মোড়ের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র এক খোদিত ফলকে
অদৃষ্টলিপির মত পরস্পর বিরোধী রাস্তার
করুণ কষ্টের কথা লেখা আছে কলিত পাথরে।

বামে যদি যাও তবে শোন পান্থ, বামের বিধান ঃ
বড়ই ভীষণ রাস্তা ভয়ানক তৃষ্ণার সড়কে
উদ্ভিদশোষক রৌদ্র ঝরে যাবে দারুণ নিয়মে।
সারা পথে হাহাকার। ড্রাগনের নিঃশ্বাসের তেজে
আদিগন্ত বয়ে যাবে একটানা বর্বর বাতাস।
নির্জল নির্মেঘ নীল, যেন-এক অনড় নিদাঘ
ক্রমান্বয়ে ঢেলে যায় মহাতপ্ত অনল কলস।
পাখি নেই, পুষ্প নেই, নেই পাতা পতঙ্গ উদ্ভিদ
পরিচিত সূর্য শুধু ধরে আছে মৃত্যুর নিশান।

বিশাল মরুর পরে অকস্মাৎ কুটিল পর্বত
অবশেষে দেখা দিলে দিগভ্রান্ত সম্মুখে তোমার
নির্ভয়ে উঠতে হবে অতিশয় অত্যুঙ্গ শিখরে।
অকম্পিত থাকতে হবে, সাবধান ! মায়ার পর্বত
কেবলই কায়িক শ্রমে ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন দেখাবে।
কঙ্কাল, কঙ্কাল শুধু, চতুর্দিকে মৃত্যুর আহার ;
পাথরের তাকে তাকে পূর্বপথচারীর খুলিতে
নির্দয় বায়ুর বেগ সাংঘাতিক করতাল বাজায়।
অবশিষ্ট আবরণ উড়ে যায়। সম্পূর্ণ পুরুষ
উলঙ্গ উঠতে হবে অতঃপর পর্বত চূড়ায়।

শিখর বিন্দুতে গেলে বিপরীত ঢালুর সাক্ষাৎ
পাওয়া যাবে হে বিজয়ী, শান্ত স্নিগ্ধ-সুগম সিঁড়ির
ধাপে ধাপে নেমে যাবে সানুদেশে, প্রার্থিত প্রদেশে
এবং সেখানে গেলে সমতলে বৃক্ষের বাহার
পার হয়ে বামে যেও, দেখতে পাবে তোমার তোরণ।

দক্ষিণে কি যাবে তুমি, ডানদিকে ? দারুণ দক্ষিণ—
এওতো পিচ্ছিল পথ, ঝড়ে জলে তেমনি দুর্গম।
নিষ্প্রদীপ নেমে গেলে সূর্যহীন শীতের সড়কে
দানব হাওয়ার মধ্যে অতিশয় বৃষ্টির শায়ক
প্রাগৈতিহাসিক রোষে সারা দেহে কামড় বসাবে।
বাতাস এমন যেন অবলুপ্ত হাওয়ানের দল
সর্বত্র তাড়িয়ে ফেরে। দিগ্বিদিক তাড়না তান্ডবে
বধির বিভ্রান্ত সব। এমন কি নিজের চিৎকার
সেখানে পশেনা কানে। ধুম্রময় দয়ালু বিদ্যুৎ
মুহুর্মুহু লেখে মৃত পূর্বপদচারীদের নাম।

সাপের দেহের মত অতিকায় পিচ্ছিল সড়ক
পার হতে পারো যদি একবার অশনি সঙ্কেতে
সহসা দেখতে পাবে সামনে এক জলের বিস্তার।
এই সে সমুদ্র দ্যাখো, যার নাম মরণপয়োধি।

কোথাও ভাসানো নেই কারো কোনো অর্ণববাহন
কেবল একটি নৌকা পড়ে আছে তীরের বালুতে
একটি সামান্য নাও, এ তরঙ্গে উপযোগী নয়।

তবুতো ভাসাতে হবে দুঃসাহসী দুঃখের ভাসান।

পাল নেই, দাঁড় নেই মস্ত কালো জলের ফানুস
অন্তহীন ফেটে যাবে অন্ধকার তোমার তরীতে।
তিমির ফোঁপানি আর কদাকার হাঙরের মুখ
জাগাবে ভয়ের ব্যাধি, বিবমিষা, সমুদ্রের রোগ।

দলবেঁধে ছুটে এলে দরিয়ার দানবের মুখে
একে একে ছুঁড়ে দিও পরিধেয় তোমার লেবাস :
নিক্ষিপ্ত কাপড় নিয়ে তরঙ্গের নির্বোধ পশুরা
পরস্পর কাড়াকাড়ি করে যাবে উত্তাল সাগরে।

হয়তো তখুনি কিম্বা তারো পরে হে নগ্ন নাবিক
মাছের পেটের মতো দেখা দেবে শাদা পূর্বদিক।
তখন দক্ষিণে দ্যাখো, সূর্যের সামান্য দক্ষিণে
সমুদ্রের সমতলে পর্বতের পাদদেশে স্থির
বন্দরের বহিরেখা, কোলাহল আর সিংহদ্বার।

ত্যাগে দুঃখে

আজকাল চোখে আর অন্য কোন স্বপ্নই জাগে না।

কবিতার কথা বুঝি, কবিতার জন্যে বহুদূর একাকী গিয়েছি
পদচারণার স্মৃতি সারাদিন দুঃখবোধ ঐকান্তিক সখ্যতা ভেঙেছে
ত্যাগে দুঃখে ভরে আছে সামান্য পড়ার ঘর
সন্তানসহ দুঃখী সঙ্গিনীর মুখ।

অবোধ বাল্যেও নাকি একটা ছোট কাপও ভাঙিনি—
আমার আম্মা প্রায়ই আমার বোনের কাছে শৈশব শোনান।
সুন্দর ফ্লাওয়ার ভাস জ্যান্ত পাখির ডানা কবিতার ছন্দ ইত্যাদি
কেন জানি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমি
কিছুতেই ভাঙতে পারি না।

ক্রিশেনথিমাম নাকি ইতস্তত ছড়িয়ে লাগালে
অবশেষে উদ্যান বড় সুন্দর দেখায়। কই, আমি তো এখনও
আমার উদ্ভিদগুলো সাজিয়ে লাগাই !

মন্ত্র

ঝরুক পাতা পুরনো পাতা হলুদ পাতা ঝরুক
বীজের মুখ সবুজ কুঁড়ি অবুঝ মাথা গড়ুক।

শুকনো সেই নদীতে আজ নতুন বান আসুক,
আটকে রাখা নৌকাগুলো স্রোতের টানে ভাসুক।

প্রবীণ মহারাজারা আজ মুকুটগুলো খুলুন.
সাহসী কিছু মানুষ দাও. মস্তকে তা তুলুন।

আগের সব কবিরা এই মাঘের শীতে পালাক
তরুণ কেউ প্রেমিক এসে নতুন গান ঝালাক।

কালকে যারা বালিকা ছিল. নিজের বুক দেখুন,
অতল চোখে কাজল টেনে নিগূঢ় ছল লেখুন।

গভীর পুরো কুয়াশা যাক হাওয়ার তোড়ে ভেসে
আগুন, পানি. খাদ্য হাতে ক্ষুধার্তরা এসে—

নীরব নীল শীতের মাসে লাগিয়ে দিক আগুন
করুণ মুখ তরুণ যত আগুন দেখে জাগুন।

অসীম সাহসে

ফররুখ আহমদ শ্রদ্ধাস্পদেষু

তাকান, আকাশে অই অন্ধকার নীলের দ্যুলোকে
এমন তারার কণা, যেন কোন স্থির বিশ্বাসীর
তস্‌বিহ্‌ ছেঁড়া স্ফটিকের দানা। শূন্য সৌরলোকে
পরীর চাঁদের নাও দোল খায়। অলীক নদীর

অস্থির পানির আভা স্পর্শ করে দূর বাতাসের
অসীম সাহস : আর ছুঁয়ে যায় পৃথিবীর ঘুম
অলক্ষ্য তড়িতে কাঁপে যে কঙ্কাল কালপুরুষের
তারি মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে তোলা যাবে আকাশ কুসুম ?

আবার মাটির কাছে যখন ফেরাবো চোখ আমি :
অরণ্যে পর্বতে বৃক্ষে কাকে পাবো, কবি না সুন্দর—
নাকি চিত্রকর তিনি—বুঝি না তো : এত দ্রুতগামী

তারি সে অশ্ব চলে পার হয়ে প্রশ্নের শহর
শুনি না হ্রেষার ক্লান্তি, অই...অই...বিরল বাদামি
কার দেহ পিঠে নিয়ে ঢাকা দেয় শোকের কাপড় ;

কলস ভাসিয়ে

প্রবল স্রোতের কাছে গিয়েছিলো কাল
কলস ভাসিয়ে তীরে দাঁড়াল যখন
কেমন আলতা রঙে হলো লালে লাল
বধির অধীর পানি। সাপের মতন

ছল ছল শব্দ করে ফণা তুলে আসে
সবল জানুর নীচে শীতল মদির
ছোবল হানতে চায়। চটুল বাতাসে
ফোটায় তরল হাসি অতল নদীর।

ঘট ভরে ঘরে ফেরা পিছে রেখে গাঙ
অবশ উরুতে তার ঝরে টস টস
চেয়ানো পানির ফোঁটা। চুড়ি টুং টাং

বাজে আর ছলকায় সজল কলস।
আশেপাশে রাতে আসে কাজল, করুণ
পায়ে তার মল বাজে চলার দরুন।

শূন্য হাওয়া

ধ্বনিরা সব ফুরিয়ে যায়
নিত্য ব্যবহারে
শূন্য হাওয়া চতুর্দিকে
বুলায় লাল জিভ ;
জোটেনা কোনো শব্দকণা
কবির ওঙ্কারে
তখন কার আহত মুখ
দাঁড়াল পার্থিব ?

উদোম তার বুকের ভার
উদার হাতে খুলে.
মোহিনী এক জননী যেন
রমণী হতে চায় ;
ঘুমের ছল কামের জল
এখনো নাভিমূলে
মোছেনি তবু আবার এলো
আগের শয্যায় ।

কিছুই যেন কাঁপেনা তার
ভাঙেনা সৌষ্ঠব
শীত বিদায় গ্রীষ্ম যায়
জমেনা স্বেদকণা ;
সর্বদাই নিজের কাছে
নিরীহ পরাভব
গোপন রাখে দু'চোখে আঁকে
রাতের আল্পনা ।

নিয়মহীন বিষাদ দু'টি
বুকের ভারে নত,

গভীর এক ভঙ্গি ধরে
উরুর অধিকার ;
গন্ধহীন পুষ্প যেন
ফাগুনে উদ্যত
মুদ্রাহীন সর্প খেলে
কামের টঙ্কার।

নির্ভুল নামে

যেন কোনো গ্রাম নেই, পথ নেই, লোকজন চিনি না কাউকে।

অথচ সুদূর স্বপ্ন ছিলোনা কি ? ছিলো না পাখির
মানুষের মুখ. কিংবা বুকের বিষয়
উড়ালে উডডীন কিছু কালো চিহ্ন ?
যা নাকি আলাদা করে. ভিন্ন অর্থে পার্থক্য বোঝায়
নাসিকা, ওষ্ঠের বাঁক. চোখ কালো. তিলটি কোথায় কিম্বা
কি ছাঁদে বাঁধলে খোঁপা তোমাকে চিনবো।

মনে হয় আজ আর এ রকম পার্থক্য বুঝি না। অথচ রঙের
এখনো ফারাক বুঝি, লাল কালো হলুদ সবুজ
একটি ইজেলে থাকলে নির্ভুল নাম ধরে ডাক দেওয়া
এখনো সম্ভব।
এখনো পারবো বলতে বৃক্ষের কি নাম. তাতে ধরে কোন ফুল
কখন জোয়ার আসবে. কেমন গর্জন হলে বৃষ্টি হতে পারে
বাতাসে কিসের তৃষ্ণা, শস্যের ঘ্রাণ টেনে এমনও পেরেছি—
কখন ফসল উঠবে দিনক্ষণ সঠিক জানাতে।

একটি চাষীর মত এসমস্ত প্রাকৃতিক আয়াত শিখেছি।

কেবল পারি না জানতে মাংসের বহুবর্ণ বিষয়সমূহ
কিভাবে বিদীর্ণ বংশে কি রকম বিভেদ ফোটালো।

আমি তো বৃক্ষাদি চিনি বলতে পারি এটা কোন ফল
এখন কি মাস যায়. খ্রীস্টের যাওয়ার পর কতকাল বিফল হয়েছে।

তবু কেন তোমাকে চিনি না।
তবুও তোমাকে কেন দীনা বলে অকস্মাৎ ভুল করে ডাক দিয়ে উঠি
তুমি তো হাসিনা।

ঈক্ষণ

যতবার নাম ধরে ডাক শুনি, ততবারই—এই আমি, এইতো রয়েছি
বলে চকিতে ঘুরাই মুখ. কে তুমি আমাকে ?
অথচ চেনেনা কেউ, জানেনা কি নাম, পেশা, কোথায় নিবাস
এখানে এসেছি কেন, কাকে চাই, যাবো কোন গাঁয়।

আমি তো নিসর্গগামী আমাকে চেনেনা কেউ. আমিও চিনিনা।
হলুদ পাখির খোঁজে ঘুরি ফিরি, এমন সন্ধ্যায়।
সোনার পালক তার. লাল চঞ্চু গায় দিনমান
আমি সেই পাখি চাই. আমি সেই অলীক গাছের
শাখায় মেলবো চোখ অন্ধকার পাতার পৃষ্ঠায়।

কে আমার নাম ধরে ডাক দিলে ?   কণ্ঠস্বর বড় চেনা লাগে।
তুমি কোন দৃশ্যে আছো. খুলে ধরো দেখবো ঝলক
    তুমি তো প্রান্তরে নেই, এই তো প্রান্তর।
তুমি কোন বৃক্ষে আছো ?   কই, সব শূন্য শাখা দোলে।

অদৃশ্য বাতাস বয়, বাতাসেও তোমাকে দেখি না !

রবীন্দ্রনাথ

এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ উত্থান রহিত
নৈশব্দের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখিও বসে না।
নদীগুলো দুঃখময়, নির্পতগ মাটিতে জন্মায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্যকোন শ্যামলতা নেই।

বুঝিনা, রবীন্দ্রনাথ কি ভেবে যে বাংলাদেশে ফের
বৃক্ষ হয়ে জন্মাবার অসম্ভব বাসনা রাখতেন।
গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই আর, জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।

শুনুন, রবীন্দ্রনাথ আপনার সমস্ত কবিতা
আমি যদি পুঁতে রেখে দিনরাত পানি ঢালতে থাকি
নিশ্চিত বিশ্বাস এই, একটিও উদ্ভিদ হবেনা
আপনার বাংলাদেশ এ রকম নিষ্ফলা, ঠাকুর !

অবিশ্বস্ত হাওয়া আছে, নেই কোন শব্দের দ্যোতনা,
দু'একটা পাখি শুধু অশথের ডালে বসে আজও
সঙ্গীতের ধ্বনি নিয়ে ভয়ে ভয়ে বাক্যালাপ করে ;
বৃষ্টিহীন বোশেখের নিঃশব্দ পঁচিশ তারিখে।

নিদ্রিতা মায়ের নাম

তাড়িত দুঃখের মত চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল
রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ, উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে
তীরের ফলার মত
নিক্ষিপ্ত ভাষার চীৎকার ঃ

বাঙলা, বাঙলা—

কে নিদ্রামগ্ন আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করো ?

জানালায় মুখ রেখে চকিতে দেখলাম
উদয়ের প্রান্তদেশে ভেসে ওঠে কালের কহ্লার
আর সমস্ত রাজপথে ফেব্রুয়ারীর নিঃশঙ্ক পাখির আওয়াজ
রক্তাভ ফুলের মত আমার সঙ্গীতজ্ঞ ভাইদের মুখাবয়ব।

বাঙলা...বাঙলা...

আমার নিদ্রিতা মায়ের নাম ইতস্তত উচ্চারিত হলো।

ভয় থেকে

তোমরা কেউনা, কিন্তু আমি যেন দারুণ ধাঁধার
আঁধার গোলকে যাচ্ছি ; ভয় লাগে ভয়ের বিকট
উদরে যাবো না বলে ভাবতাম। ভয়ংকর কার
দেখি না এমন হস্ত আমারে কি টানে সন্নিকট ?

পরিবর্তনের দিকে, বুঝি সবি, কিন্তু কতদূর
এখনো ধর্মের গন্ধ উৎকট আমারো সহায়
'আমারে ফিরিয়ে নাও'—এ সমস্ত আপাতমধুর
লোবানের মত বাক্য অল্প অল্প সুগন্ধ ছড়ায়।

কত যে বিবর্ণ বাতি জ্বলে গেলো, হায়রে অভ্যাস
অন্ধকারে অহেতুক আরেকটি অসত্য আগুন ;
যেখানে সমস্ত রন্ধে হাওয়া আসে, সেই নিরাশ্বাস
কিভাবে ঠেকানো যাবে, অন্তরাল রক্তে গুন গুন

তার চেয়ে বেজে যাক দিনমান। তোমার তালাশ
করবে না আর কেউ, ছদ্মবেশ নিওনা নতুন।

সোনালি কাবিন

প্রকৃতি

কতদূর এগোলো মানুষ !
কিন্তু আমি ঘোরলাগা বর্ষণের মাঝে
আজও উবু হয়ে আছি। ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে
কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে
ভাবলাম, এ-মৃত্তিকা প্রিয়তমা কিষাণী আমার।
বিলের জমির মত জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়
যে নারী উদাম করে তার সর্ব উর্বর আধার।

বর্ষণে ভিজছে মাঠ। যেন কার ভেজা হাতখানি
রয়েছে আমার পিঠে। আর আমি
ইন্দ্রিয়ের সর্বানুভূতির চিহ্ন ক্ষয় করে ফেলে
দয়াপরবশ হয়ে রেখেছি আমার কালো দৃষ্টিকে সজাগ।

চতুর্দিকে খনার মন্ত্রের মত টিপ টিপ শব্দে সারাদিন
জলধারা ঝরে ! জমির কিনার ঘেঁষে পলাতক মাছের পেছনে
জলডোরা সাপের চলন নিঃশব্দে দেখছি চেয়ে।
বাহুতে আমার
আতঙ্কে লাফিয়ে উঠছে সবুজ ফড়িং।

বুঝিবা স্বপ্নের ঘোরে আইল বাঁধা জমিনের ছক
বৃষ্টির কুয়াশা লেগে অবিশ্বাস্য যাদুমন্ত্রবলে
অকস্মাৎ পাল্টে গেলো। ত্রিকোণ আকারে যেন
ফাঁক হয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী।
আর সে জ্যামিতি থেকে
ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক
আমার চেতনা জুড়ে খুঁটে খায় পরস্পর বিরোধী আহার।

বাতাসের ফেনা

কিছুই থাকে না দেখো, পত্র পুষ্প গ্রামের বৃদ্ধরা
নদীর নাচের ভঙ্গি, পিতলের ঘড়া আর হুঁকোর আগুন
উঠতি মেয়ের ঝাঁক একে একে কমে আসে ইলিশের মৌসুমের মত
হাওয়ায় হলুদ পাতা বৃষ্টিহীন মাটিতে প্রান্তরে
শব্দ করে ঝরে যায়। ভিনদেশী হাঁসেরাও যায়
তাঁদের শরীর যেন অর্বুদ বুদ্বুদ
আকাশের নীল কটোরায়।

কিছুই থাকে না কেন ? করোগেট, ছন কিংবা মাটির দেয়াল
গাঁয়ের অক্ষয় বট উপড়ে যায় চাটগাঁর দারুণ তুফানে
চিড় খায় পলেস্তরা, বিশ্বাসের মতন বিশাল
হুড়মুড় শব্দে অবশেষে
ধসে পড়ে আমাদের পাড়ার মসজিদ !

চড়ুইয়ের বাসা, প্রেম, লতাপাতা, বইয়ের মলাট।
দুমড়ে মুচড়ে খসে পড়ে। মেঘনার জলের কামড়ে
কাঁপতে থাকে ফসলের আদিগন্ত সবুজ চিৎকার।
ভাসে ঘর, ঘড়া-কলসী, গরুর গোয়াল
বুবুর স্নেহের মত ডুবে যায় ফুল তোলা পুরনো বালিশ।
বাসস্থান অতঃপর অবশিষ্ট কিছুই থাকে না
জলপ্রিয় পাখিগুলো উড়ে উড়ে ঠোঁট থেকে মুছে ফেলে বাতাসের
ফেনা।

দায়ভাগ

ভোলো না কেন ভুলতে পারো যদি
চাঁদের সাথে হাঁটার রাতগুলি
নিয়াজ মাঠে শিশির-লাগা ঘাস
পকেটে কার ঠাণ্ডা আঙ্গুলি
ঢুকিয়ে হেসে বলতে, অভ্যাস ;

বকুলডালে হা

মোছো না কেন মুছতে পারো যদি
দেয়ালে কালো অঙ্গারের দাগ,
রঙ্গভরে ফোটাতে মুখ যার
ভাবনা ছিলো করবো কিনা রাগ
কণ্ঠা বেয়ে কাঁপতো সরু হার ;

খেলার বুঝি থাকে না দায়ভাগ ?

তোমাদের ছাদে ওঠে তো গোল চাঁদ
সাহস থাকে ঢাকো না জ্যোস্‌নাকে
হাঁসের খেলা ভাসায় ভরা নদী
কাটো না জল যদি বা দোষ থাকে :
রক্তলোভী আলোছায়ার ফাঁদ—

ভাঙো না কেন ভাঙতে পারো যদি।

কবিতা এমন

কবিতা তো কৈশোরের স্মৃতি। সে তো ভেসে ওঠা ম্লান
আমার মায়ের মুখ ; নিম ডালে বসে থাকা হলুদ পাখিটি
পাতার আগুন ঘিরে রাতজাগা ছোট ভাই-বোন
আব্বার ফিরে আসা, সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি—রাবেয়া রাবেয়া—

আমার মায়ের নামে খুলে যাওয়া দক্ষিণের ভেজানো কপাট !
কবিতা তো ফিরে যাওয়া পার হয়ে হাঁটুজল নদী
কুয়াশায়-ঢাকা-পথ, ভোরের আজান কিম্বা নাড়ার দহন
পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ
মাছের আঁশটে গন্ধ, উঠোনে ছড়ানো জাল আর
বাঁশঝাড়ে ঘাসে ঘাসে ঢাকা দাদার কবর।

কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর
ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, নিশান
চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে
নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।

কবিতা চরের পাখি, কুড়ানো হাঁসের ডিম, গন্ধভরা ঘাস
ম্লান মুখ বউটির দড়ি ছেঁড়া হারানো বাছুর
গোপন চিঠির প্যাডে নীল খামে সাজানো অক্ষর
কবিতা তো মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার।

আসেনা আর

পাহাড়পুরের পাথর রেখে বামে
পেরিয়ে খাল, পুরনো গড়খাই
এগোলে কেউ আসে না আর ঘরে
এই কথা তো জানতে, তবু কেন
হাটের মাঝে আসতে দিয়েছিলে ?

তোমার শিকায় রঙ মাখাতো যারা
তোমায় এনে দিতো মোরগফুল
তাদের হাত ফেরালে একবার
কখনো তারা আসে না আর গাঁয়ে
সেই কথা তো জানাই ছিল, তবু
বানের জলে ভাসতে দিয়েছিলে !

তোমায় যারা বলতো যাদুকরী,
তোমায় যারা ডাকতো কালোসাপ,
যাদের দেখে ভাঙে কাঁখের ঘড়া,
যাদের ভয়ে মুখ লুকাতে জলে,
দীঘির পাড়ের অন্ধ জনরবে
তখন কেন হাসতে দিয়েছিলে ?

অবগাহনের শব্দ

জানি না কি ভাবে এই মধ্যযামে আমার সর্বস্ব নিয়ে আমি
হয়ে যাই দুটি চোখ, যেন জোড়া যমজ ভ্রমর পাশাপাশি
বসে আছে ঈষদুষ্ণ মাংসের ওপর।

চেতনাচেতনে যেন হেঁটে যায় অন্ধকার। সাপের জিহ্বার মত দ্রুত
কম্পমান
অনুভূতি ছুঁয়ে যায় এলোমেলো রক্তের পর্দায়।
আমার সমস্ত মর্মে যেন এক বালকের বিদায়ের বিষণ্ণ লগন
লেগে থাকে। সর্বশেষ আহার্যের থালা থেকে উষ্ণ গন্ধময়
ধোঁয়া হয়ে উড়ে এসে নাকে লাগে মায়ের আদর।

বিদায়, বিদায় দাও হে দৃশ্য, হে জন্মান্ধ পশ্চাৎ
আর কেন লগ্ন হও, অন্ধকার হয়ে থাক গাছপালা বাসস্থান নদী
পাখির ডাকের মত অন্তর্হিত হয়ে যাও অমলিন গভীর সবুজে।

নদীর শরীর ঘেঁষে যেতে যেতে চেয়ে দেখি ওপারে হঠাৎ
আলোর গোলক হয়ে উঠলেন দিনের শরীর।
অবগাহনের শব্দে ছল ছল ঘাটের পৈঠায়
কে যেন বললো স্নেহে সঙ্গিনীকে,
চেয়ে দেখ্ অই
কোন মা মাঘের ভোরে প্রাণ ধরে ছেড়েছে এমন
দুধের দুলাল তার। কুয়াশায় হেঁটে যাচ্ছে, আহা কি কষ্টের।

পাখি ওড়া দেখা আর হেঁটে যাওয়া নদীর পেছনে দিনমান
যেন আর খেলা নয়। ঘাম জমে ললাটে চিকন
হাঁটুতে ধুলোর দাগ। হাত তুলে আলোকে আড়াল
এখন হবে না আর। তুঙ্গ হয়ে দিনের দেবতা অগ্নিময় আকাশে
গেলেন।
আবার জলের শব্দে চেয়ে দেখি, অবগাহনের পালা
ঘাটময় গ্রামের মেয়েরা আমারে দেখিয়ে বলে, কে অই পুরুষ যায়
কোন গাঁয় জানি কোন রূপসীর ঘরে।

তৃষ্ণা মরে গেলে পরে স্বেদবিন্দু সন্ধ্যার হাওয়ায়
কখন শুকায় ফের। চরের পাখিরা
মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবশেষে উড়ে যায় রক্তাভ ডানায়।

বড় অবসাদ লাগে। দুঃখ নয় যাচ্ঞা নয় বুঝি কোন পিপাসা আমাকে
করে না তাড়না আর। কোন ঘাটে এসেছি জানি না
অষ্টাদশ কলসী নিয়ে ঘরে ফিরে বধূরা এখন।
কে নারী বললো বড় গাঢ় স্বরে, পার হয়ে অন্ধকার বিল
না জানি কোথায় যাবে এই বৃদ্ধ পথিক পুরুষ।

এই সম্মোহনে

তোমার জন্যে লোকালয়
হেঁটে এসে আজো কড়া নাড়ি,
তোমার জন্যে করি জয়
অভাবের ক্ষিপ্ত তরবারি।

তুমি আছো এই সম্মোহনে
খুলতে যাই মৃত্যুর তামস,
অবারিত চুম্বনে, গুঞ্জনে
ধরে থাকি তোমাকে, অবশ।

সবুজ গন্ধের এক গাছ
যেন আমি ; স্ফটিকের ঘর,
কাচের আধারে কালো মাছ
মুখে নেয় সোনালি পাথর।

এ্যাকুরিয়ামের মতো ছোট
স্বচ্ছ শাদা সংসার আমার,
কে মৎসিনী দীপ্ত হয়ে ওঠো
ছলকে নীল জলের আধার।

ক্ষুধার্ত এ মুখ তুলে যত
বাতাসের বিন্দু আনা যায়
এ মহার্ঘ বুদ্বুদ কহ তো
রাখবে কোন শৈবালের গায় ?

শব্দহীন ভুরভুরির গতি
হয়ে যায় আনন্দের ফুল
খায় এক মাছের যুবতী
ঠুকরে খায়, আমার আঙুল।

প্রত্যাবর্তনের লজ্জা

শেষ ট্রেন ধরবো বলে এক রকম ছুটতে ছুটতে স্টেশনে পৌঁছে দেখি
নীলবর্ণ আলোর সংকেত। হতাশার মতোন হঠাৎ
দারুণ হুইসেল দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।
যাদের সাথে শহরে যাবার কথা ছিল তাদের উৎকণ্ঠিত মুখ
জানালায় উবুড় হয়ে আমাকে দেখছে। হাত নেড়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

আসার সময় আব্বা তাড়া দিয়েছিলেন, গোছাতে গোছাতেই
তোর সময় বয়ে যাবে, তুই আবার গাড়ি পাবি।
আম্মা বলছিলেন, আজ রাত না হয় বই নিয়েই বসে থাক
কত রাত তো অমনি থাকিস।
আমার ঘুম পেলো। এক নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় আমি
নিহত হয়ে থাকলাম।

অথচ জাহানারা কোনদিন ট্রেন ফেল করে না। ফরহাদ
আধ ঘণ্টা আগেই স্টেশনে পৌঁছে যায়। লাইলী
মালপত্র তুলে দিয়ে আগেই চাকরকে টিকিট কিনতে পাঠায়। নাহার
কোথাও যাওয়ার কথা থাকলে আনন্দে ভাত পর্যন্ত খেতে পারে না।
আর আমি এঁদের ভাই
সাত মাইল হেঁটে এসে শেষ রাতের গাড়ি হারিয়ে
এক অখ্যাত স্টেশনে কুয়াশায় কাঁপছি।

কুয়াশার শাদা পর্দা দোলাতে দোলাতে আবার আমি ঘরে ফিরবো।
শিশিরে আমার পাজামা ভিজে যাবে। চোখের পাতায়
শীতের বিন্দু জমতে জমতে নির্লজ্জের মতোন হঠাৎ
লাল সূর্য উঠে আসবে। পরাজিতের মতো আমার মুখের ওপর রোদ
নামলে, সামনে দেখবো পরিচিত নদী। ছড়ানো ছিটানো
ঘরবাড়ি, গ্রাম। জলার দিকে বকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। তারপর
দারুণ ভয়ের মতো ভেসে উঠবে আমাদের আটচালা।
কলার ছোট বাগান।

দীর্ঘ পাতাগুলো না না করে কাঁপছে। বৈঠকখানা থেকে আব্বা
একবার আমাকে দেখে নিয়ে মুখ নিচু করে পড়তে থাকবেন,
ফাবি আইয়ে আলা ই-রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান......।

বাসি বাসন হাতে আম্মা আমাকে দেখে হেসে ফেলবেন
ভালোই হলো তোর ফিরে আসা। তুই না থাকলে
ঘরবাড়ি একেবারে কেমন শূন্য হয়ে যায়। হাত মুখ
ধুয়ে আয়। নাস্তা পাঠাই।
আর আমি মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে
ঘষে ঘষে
তুলে ফেলবো।

পলাতক

পলাতক বলে লোকে, বুকে বড়ো বাজে।   আমি তো এখনো
জীবনের জলাধারে হতে চাই তুমুল রোহিত।
কোথায় পালাবো আমি, যেখানে রাতেও
নারীর নিঃশ্বাস্ এসে চোখে মুখে লাগে।   বুকে লেগে থাকে ক্লান্ত
শিশুর শরীর, বলো,
পালাবো কোথায় ?

জীবনের পক্ষে তাই সারাদিন দরজা ধরে থাকি।

সকালে খেয়াড় থেকে মুরগীর বাচ্চাগুলো রোজ
সুন্দর শব্দ করে পাকালের প্রান্তে চলে গেলে
আমি তাড়াতাড়ি উঠে
হাত দিয়ে ঢেকে রাখি আগুনের মুখ।

সোনালি শঙ্খের লোভে জলদাসদের সেই একরত্তি মেয়ে
অকস্মাৎ সমুদ্রের ঢেউয়ে আটকে গেলে
আমি কি নির্ভয়ে
বঙ্গোপসাগরের জলে নামিনি একাকী ?

আর্শোলার অত্যাচারে তিক্ত হতে হতে
আমার রূপসী যবে পতঙ্গের গুষ্ঠিশুদ্ধ থেতলে দিতে যায়
শাড়ির প্রশংসা করে আমি কি তখন তারে প্রসন্ন করি না।

স্বপ্নের সানুদেশে

একদা এক অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে আমাদের যাত্রা
তারপর দিগন্তে আলোর ঝলকানিতে আমাদের পথ
উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বাতাসে ধানের গন্ধ,
পাখির কাকলিতে মুখরিত অরণ্যানী।
আমাদের সবার হৃদয় নিসর্গের এক অপরূপ ছবি হয়ে
ভাসতে লাগলো।

নদী, নদী—
সন্তানেরা উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
যে স্পষ্ট জলধারা দেখালো, তা আমাদের প্রাণ।
এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
আমার বোনেরা বঙ্কিম রেখায় এঁটে দেহ আবৃত করেন।
দেখো সেই পুণ্যতোয়া,
যার কলস্বর আমাদের সঙ্গীতে নিমজ্জিত করে।
দেখো, দেখো।

আমরা যেখানে যাবো, সেই বিশাল উপত্যকার ছবি
আমাদের সমস্ত অন্তরকে গ্রাস করে আছে। আমাদের পতাকায়
রূপকথার বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ
আমাদের আশাকে দোলাচ্ছে সোনালি দোলকের মতো,
বার বার।

আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমরা স্বপ্নের দিকে
রওনা দিয়েছি। দুঃখ
আমাদের ক্লান্ত করে না।
দুর্যোগের রাতে আমরা এক উজ্জ্বল দিনের দিকে
মুখ ফিরিয়েছি। বিঘ্ন
আমাদের বিবশ করেনি।

চীৎকার, কান্না ও হতাশার গোলকধাঁধা ছেড়ে
আমারা বেরিয়ে যাবো। মৃত্যু
আমাদের স্পর্শ না করুক।

স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবো
বাম দিকে বয়ে যাবে রুপোলি নদীর জল, ডানে
তীক্ষ্ণ তৃষিত পর্বত।

তোমার হাতে

তোমার হাতে ইচ্ছে করে খাওয়ার
কুরুলিয়ার পুরনো কই ভাজা ;
কাউয়ার মতো মুন্সী বাড়ির দাওয়ায়
দেখবো বসে তোমার ঘষা মাজা

বলবে নাকি, এসেছে কোন গাঁওয়ার ?

ভাঙলে পিঠে কালো চুলের ঢেউ
আমার মতো বোঝেনি আর কেউ,
তবু যে হাত নাড়িয়ে দিয়ে হাওয়ায়
শহরে পথ দেখিয়ে দিলে যাওয়ার।

অন্তরভেদী অবলোকন

কাল মৃত্যু হাত বাড়িয়েছিলো আমার ঘরে। জানলার
ফাঁক দিয়ে সেই দীর্ঘ হাত অন্ধের অনুভব শক্তির মত
বিছানার ওপর একটু একটু এগোলো। আমার স্ত্রী শিশুটির
মাথায় পানির ধারা দিচ্ছিলেন। তার চোখ ছিল পলকহীন, পাথর।
স্তন দুটি দুধের ভারে ফলের আবেগে ঝুলে আছে।
পানির ধারা প্রপাতের শব্দের মত হয়ে উঠে সবকিছুতে
কাঁপন ধরিয়ে দিলো। লণ্ঠনের আলো ময়ূরের পালকের
অনুকরণে কাঁপতে লাগলো। অবিকল।

আর সেই হাত, বালিশের কাছে এসে পড়েছে, আমি
দেখলাম। স্ফীত শিরা, নখ কাটা হয়নি। রোমশ।
আমার চীৎকার করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু মৃত্যুর সামনে আমি
কোনদিন শব্দ করতে পারি না।
সেই হাত জাপটে ধরতে ক্রোধ হলো। কিন্তু মৃত্যুর শক্তি
সম্বন্ধে আমি জানতাম, আমার ধারণা ছিল।
তবে কি প্রার্থনা করবো ? না, মৃত্যু তো চেঙ্গিসের
অশ্বের মতো দ্রুতগামী, বধির।

—কে ? কে ?
জলের ধারা থমকে গেল। আমার স্ত্রী চোখ তুলে
তাকালেন। তার নগ্ন হাতে শূন্য জলপাত্র। ব্লাউজের বোতাম
খুলে গিয়ে 'ম' -এর আকারের মতো কণ্ঠা উদোম হয়ে আছে।
নির্জল চোখে অন্তরভেদী অবলোকন।
আমি মৃত্যুর দিকে তাকালাম। দেখি, কুকুরের লেজের
মত সে জানলার দিকে গুটিয়ে যাচ্ছে।   নখ কাটা হয়নি,
স্ফীতশিরা রোমশ।

যার স্মরণে

স্মরণে যার বুকে আমার জলবিছুটি
আমার ঘরে রাখলো না সে চরণ দু'টি।
ধানের সবুজ করলো কি যে আড়াল দিয়ে
যাসনে মেয়ে, মন্ত্র দিলো বনের টিয়ে।
নাওয়ের বাদাম ডাকলো তারে ; চরের মাটি
আদর করে বিছিয়ে দিলো শীতলপাটি ;
ভয় ধরিয়ে ডাকলো হুতোম ছাতিম গাছে
বন্য বাতাস কাঁপলো এসে বুকের কাছে।
পাতার ফাঁকে রাত্রি যখন নামলো সেজে
সেই যুবতীর বাংড়ি হাতে উঠলো বেজে।
হঠাৎ নদী ধরলো এসে সাপের ফণা
হাওয়ার আঘাত করলো তারে অন্যমনা !
খোঁপার বাঁধন ভাঙলো যখন যত্নে গড়া
ব্যর্থ হলো আমার সকল মন্ত্রপড়া।

নতুন অব্দে

ভাতের গন্ধ নাকে এসে লাগে ভাতের গন্ধ
জেগে উঠতেই চারিদিকে দেখি, দুয়ার বন্ধ।
দ্বার খোলবার সাহসে যখন শরীর শক্ত
হঠাৎ তখুনি মহতেরা বলে লোকটা অন্ধ ;

বুকের অতলে লাফায় নীরবে আহত রক্ত।

ধানের স্বপ্ন দু'চোখে আমার, এই নগণ্য—
দাবী তুলতেই কারা বলে ওঠে বন্য, বন্য।
ধান তোলবার অস্ত্র নিলাম বিপুল শব্দে।
হঠাৎ তখুনি মনীষীরা বলে এ-ও জঘন্য।

তবু তো সূর্য উঠে আসে দেখি নতুন অব্দে।

স্বপ্নে আমায় ডেকে ওঠে এক সুখের পক্ষী
ঘুম ভেঙে আজ চলেছি তাহার কূজন লক্ষ্যি
কতদূর গেলে পাওয়া যাবে সেই নীল বিহঙ্গ
আমি হতে চাই দিনমান তার শরীর রক্ষী।

তারে নিরালায় পেতে দিতে চাই আমার অঙ্গ।

আমিও রাস্তায়

অসংখ্য চক্ষু যেন ঘিরে ফেলবে এখুনি আমাকে
শস্যের সবুজ থেকে ক্রমাগত উঠে এসে গোসার গোঙানি
করোগেটে ঢেউ তুলে চাবকে দেবে আমাকে নির্মম।
তন্নতন্ন দেখে নেবে বাসন কোশন
          পুঁথিপত্র ছারখার ছড়িয়ে চৌদিকে
শিকার পাইলা খুলে দেখবে নেই, ভাত বা সালুন।

কইরে হারামজাদা, দেখুম আজকা তর হগল পুংটামি
কোনখানে পাড়ো তুমি জবর সোনার আন্ডা, কও মিছাখোর ?
বলেই টানবে লেপ, তারপর তাজ্জবের মতো
পেথম উদাম করে দেখবে এক বেশরম কাউয়ার গতর।

গালি-গালাজের ঢেউ টলমলায় আমার উঠোনে
আমারে ভাসিয়ে নেয় খাদ্যলোভী ক্ষোভের কাতারে
সাপের অঙ্গের মতো ভঙ্গি ধরে, টান মারে, মিছিলে রাস্তায়।
সাহস দেখো না মিয়া, শহরে আগুন দিতে আহে ঐ
          বে-তমিজ গাওয়ের পোলারা।

দিলো বাইন্ধা পথঘাট, বাস গাড়ি মোটর দোকান
গোলমালের কারিগর ইটা মারে মুরুব্বির গায়।
          সাহস দেখো না মিয়া, বে-তমিজ বান্দীর পুতেরা
মাইনষের লওয়ের মতো হাঙ্গামার নিশান উড়ায়।

পালক ভাঙার প্রতিবাদে

আমি যেন সেই পাখি, স্বজন পীড়নে যারা
কালো পতাকার মতো হাহাকার করে ওঠে, কা-কা
আর্তনাদে ভরে দেয় ঘরবাড়ি, পালক ভাঙার
উপায়বিহীন প্রতিবাদে
আকাশ কাঁপিয়ে কাঁদে।
ছত্রখান হয়ে উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে পাখসাটে
পিষ্ট প্রায় সঙ্গীর দশায়।

এমন রোদন ধ্বনি কেন আজ বেজে ওঠে ?
এইতো সেদিনও
বোস্তামীর পুকুরের ঘোলা-ময়লা জলের কাছিম
হওয়ার সাধনা ছিলো, টকটকে লাল
মাংসের মন্ডের মতো লোভ এসে ছিটকে পড়তো
থকথকে সিঁড়িতে সারাদিন।

আজ যেনো ভেঙে গেলো দারুণ খোলস, খুলে গেলো যেন
আমার কঠিন প্রাণ। রহস্যের ময়লা কালো জলে
অজস্র সফেদ ফিটকিরি ইতস্তত ছুঁড়ে দিয়ে কেউ
সহসা ধরিয়ে দিলো কম্পমান পানির পাতালে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে যাওয়া নির্বোধের মুখচ্ছবিখানি।

এ মুখ আমার নয়, এ মুখ আমার নয়, বলে –
যতবার কেঁপে উঠি, দেখি,
আমার স্বজন হয়ে আমার স্বদেশ এসে
দাঁড়িয়েছে পাশে। নির্ভয়ে, আশ্বাসে
জিয়ল মাছের ভরা বিশাল ভান্ডের মতো নড়ে ওঠে বুক।
ব্যাকুল মুখের সারি ক্ষমার সুরভি নিয়ে আজ
হঠাৎ ফোটালো এক রক্তবর্ণ শতমুখী ফুল।

কাতারে কে ডাকে নাম ধরে ?   আদেশের গম্ভীর নিনাদে
আমার নামের ধ্বনি আমারই শরীর ঘিরে
ঝিঁঝির শব্দের মতো ঢুকে গেলো গ্রামের ভিতর।

মনে হলো, ডাক দিলে জড়ো হয়ে যাবে সব নদীর মানুষ
অসংখ্য নাওয়ের বাদাম মুহূর্তে গুটিয়ে ফেলে রেখে
জমা হয়ে যাবে এই চরের ওপর।
খেতের আড়াল থেকে কালো
মানুষের ধারা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে
কী ভাবে এগোবে তারা দুর্ভেদ্য নগরের তোরণে প্রথম।

খড়ের গম্বুজ

কে জানে ফিরলো কেনো, তাকে দেখে কিষাণেরা অবাক সবাই
তাড়াতাড়ি নিড়ানির স্তূপাকার জঞ্জাল সরিয়ে
শস্যের শিল্পীরা এসে আলের ওপরে কড়া তামাক সাজালো।
একগাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে
কে যেনো ডাকলো তাকে ; সস্নেহে বললো, বসে যাও,
লজ্জার কি আছে বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে,
আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপের
মারফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়ে যেতো।
পুরনো সে কথা উঠলে এখনও দহলিজে
সমস্ত গাঁয়ের লোক নরম নীরব হয়ে শোনে।

সোনালি খড়ের স্তূপে বসতে গিয়ে—প্রত্যাগত পুরুষ সে-জন
কী মুস্কিল দেখলো যে নগরের নিভাঁজ পোশাক
খামচে ধরেছে হাঁটু। উরতের পেশী থেকে সোজা
অতদূর কোমর অবধি
সম্পূর্ণ যুবক যেনো বন্দী হয়ে আছে এক নির্মম সেলাইয়ে।
যা কিনা এখন তাকে স্বজনের সাহচর্য, আর
দেশের মাটির বুকে, অনায়াসে
বসতেই দেবে না।

তোমাকে বসতে হবে এখানেই,
এই ঠান্ডা ধানের বাতাসে।
আদরে এগিয়ে দেওয়া হুঁকোটাতে সুখটান মেরে
তাদের জানাতে হবে কুহলি পাখির পিছু পিছু
কতদূর গিয়েছিলে পার হয়ে পানের বরোজ !

এখন কোথায় পাখি ? একাকী তুমিই সারাদিন
বিহঙ্গ বিহঙ্গ বলে অবিকল পাখির মতন
চঞ্চুর সবুজ লতা রাজপথে হারিয়ে এসেছো।

অথচ পাওনি কিছু, না ছায়া না পল্লবের ঘ্রাণ
কেবল দেখেছো শুধু কোকিলের ছদ্মবেশে সেজে
পাতার প্রতীক আঁকা কাইয়ুমের প্রচ্ছদের নীচে
নোংরা পালক ফেলে পৌর-ভাগাড়ে ওড়ে নগর শকুন

এক নদী

তোমার মুখ ভাবলে, এক নদী
বুকে আমার জলের ধারা তোলে ;
সামনে দেখি ভরা ভাতের থালা
ঝালের বাটি উপচে পড়ে ঝোলে।

পিঠার মতো হলুদ মাখা চাঁদ
যেনো নরম কলাপাতায় মোড়া ;
পোড়া মাটির টুকরো পাত্রকে
স্মৃতি কি ফের লাগাতে পারে জোড়া !

নীল বইচা মাছের মতো চোখ
স্বপ্নে আমায় কুশল পুছে রোজ—
'ভালো কি আছো ?' হায়রে ভালো থাকা !
নগরবাসী কে রাখে কার খোঁজ !

ফিরতে চাই, পাবো কি সেই পথ ?
তরমুজের ক্ষেতের পাশে ঘর,
লজ্জাহীনা ফাজিল ছুঁড়ি এক
ভীষণ কালো, হাসতো থর থর !

মহাকালের কালোর চেয়ে কালো
রাত-বরণী রূপসী সেই পরী,
কাঁপিয়ে কাঁখে ঠিল্লা ভরা পানি
দেহের ভাঁজে ভেজা নীলাম্বরী—

উঠতো হেঁটে জলের ধার বেয়ে ;
কালো-বাউশী যেনো কলমী বনে
অঙ্গ নেড়ে অস্ত গোলা জলে
দেখেছিলাম একদা কুক্ষণে।

ফিরলে আজো পাবো কি সেই নদী
স্রোতের তোড়ে ভাঙা সে এক গ্রাম ?
হায়রে নদী খেয়েছে সব কিছু
জলের ঢেউ ঢেকেছে নাম-ধাম।

জাতিস্মর

আমি যতবার আসি, মনে হয় একই মাতৃগর্ভ থেকে পুনঃ
রক্তে আবর্তিত হয়ে ফিরে আসি পুরনো মাটিতে।
ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া শব্দে দুঃখময় আত্মার বিলাপ
জড়সড় করে দেয় কোন দীন দরিদ্র পিতাকে।
আর ক্লান্ত নির্ভার আরামে
মায়ের সজল চোখ মুদে আসে।
কখন, কিভাবে যেন বেড়ে উঠি
পূর্বজন্মের সেই নম্রস্রোতা নদীর কিনারে।

কে কোথায় জাতিস্মর ?
সমস্ত প্রাণীর মধ্যে আমি কি কেবলই
স্মরণে রেখেছি স্পষ্ট কোন্ গাঁয়ে জন্মেছি কখন ?
অথচ মানুষ
নিজের পাপের ভারে
শুনেছি জন্মায় নাকি পশুর উদরে—
বলে ত্রিপিটক।

কী প্রপঞ্চে ফিরে আসি, কী পাতকে
বারম্বার আমি
ভাষায়, মায়ের পেটে
পরিচিত, পরাজিত দেশে ?
বাক্যের বিকার থেকে তুলে নিয়ে ভাষার সৌরভ
যদি দোষী হয়ে থাকি, সেই অপরাধে
আমার উৎপন্ন হউক পুনর্বার তীর্যক যোনিতে।
অন্তত তাহলে আমি জাতকের হরিণের মত
ধর্মগণ্ডিকায় গ্রীবা রেখে
নির্ভাবন দেখে যাবো
রক্তের ফিন্‌কিতে লাল হয়ে
ধুয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ নির্ভয়ে, নির্বাণে।

আমার প্রাতরাশে

সকালে দরজা খুলে এই রাজভিখারীর হাত
যেমন সংবাদপত্রের মত অস্থায়ী কচুর পাতায়
খেতে চায় স্ফটিকশুভ্র স্বচ্ছ স্বাদ, আজ সেই পাত্রে টলমল
ঘোলাজল সমুদ্রের। দেখো
এত বড়ো বঙ্গোপসাগরকেই আজ যেন
ভাঁজ করে পাঠালেন সাংবাদিক
সজ্জন সুধীরা।
আমার প্রাতরাশের হলদেটে
টার্টকিনি মাছের ফাঁকে ফাঁকে
কলার টুমের মত অসাবধানে শুয়ে পড়লো
ভোলার অসংখ্য মৃত কিশোরের শব। আর
সঙ্গিনীর দীপ্ত ধূম্রময় চায়ের সুনামে
সন্দ্বীপের পেটফোলা যুবতীর লাশ ধোয়া পানি
ছিটকে ছিটকে ঝরতে লাগলো একটানা।

জানলায় হাওয়ার ঠকঠকি শুনে এত ভয় ?

বুঝিবা এখুনি
লাখো লাখো মড়া গাই
বিশাল গোয়াল ভেবে
ঢুকে যাবে আমার কামরায়।
কিম্বা দেবতা বেল-এনলিল তার
আজ্ঞাবহ জলের পীড়নে
প্রাণহীন একপাল তাগড়া গরুকে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাড়িয়ে ফিরিয়ে
আমার বুকের মধ্যে ঠুকলেন
খড়কে-অলা বিশাল পাজন।

সোনালি কাবিন

সোনার দিনার নেই, দেন্‌মোহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু'টি,
আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনকালে সঞ্চয় করিনি
আহত বিক্ষত করে চারদিকে চতুর ভ্রূকুটি ;
ভালোবাসা দাও যদি আমি দেব আমার চুম্বন,
ছলনা জানি না বলে আর কোন ব্যবসা শিখিনি ;
দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন
আমার তো নেই সখি, যেই পণ্যে অলঙ্কার কিনি।
বিবসন হও যদি দেখতে পাবে আমাকে সরল
পৌরুষ আবৃত করে জলপাই পাতাও থাকবে না ;
তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিও সেই ফল
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হবো চিরচেনা
পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা ;
দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা।

২

হাত বেয়ে উঠে এসো হে পানোখী, পাটিতে আমার
এবার গুটাও ফণা কালো লেখা লিখো না হৃদয়ে ;
প্রবল ছোবলে তুমি যতটুকু ঢালো অন্ধকার
তারও চেয়ে নীল আমি অহরহ দংশনের ভয়ে।
এ কোন্‌ কলার ছলে ধরে আছো নীলাম্বর শাড়ি
দরবিগলিত হয়ে ছলকে যায় রাত্রির বরণ,
মনে হয় ডাক দিলে সে-তিমিরে ঝাঁপ দিতে পারি
আঁচল বিছিয়ে যদি তুলে নাও আমার মরণ।
বুকের ওপরে মৃদু কম্পমান নখবিলেখনে
লিখতে কি দেবে নাম অনুজ্জ্বল উপাধিবিহীন ?
শরমিন্দা হলে তুমি, ক্ষান্তিহীন সজল চুম্বনে
মুছে দেবো আদ্যাক্ষর, রক্তবর্ণ অনার্য প্রাচীন।
বাঙালি কৌমের কেলি কল্লোলিত কর কলাবতী
জানতো না যা বাৎসায়ণ, আর যত আর্যের যুবতী।

৩
ঘুরিয়ে গলার বাঁক ওঠো বুনো হংসিনী আমার
পালক উদাম করে দাও উষ্ণ অঙ্গের আরাম,
নিসর্গ নমিত করে যায় দিন, পুলকের দ্বার
মুক্ত করে দেবে এই শব্দবিদ কোবিদের নাম।
কঙ্কার শব্দের শর আরণ্যক আত্মার আদেশ
আঠারোটি ডাক দেয় কান পেতে শোনো অষ্টাদশী,
আঙুলে লুলিত করো বন্ধবেণী, সাপিনী বিশেষ
সুনীল চাদরে এসো দুই তৃষ্ণা নগ্ন হয়ে বসি।
ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দু'টি জলের আওয়াজ—
তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়,
চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ
উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়,
ঠোঁটের এ-লাক্ষারসে সিক্ত করে নর্ম কারুকাজ
দ্রুত ডুবে যাই এসো, ঘূর্ণমান রক্তের ধাঁধায়।
৪
এ-তীর্থে আসবে যদি ধীরে অতি পা ফেলো সুন্দরী,
মুকুন্দরামের রক্ত মিশে আছে এ-মাটির গায়,
ছিন্ন তালপত্র ধরে এসো সেই গ্রন্থ পাঠ করি
কত অশ্রু লেগে আছে এই জীর্ণ তালের পাতায়।
কবির কামনা হয়ে আসবে কি, হে বন্য বালিকা
অভাবের অজগর জেনো তবে আমার টোটেম,
সতেজ খুনের মতো এঁকে দেবো হিঙুলের টিকা
তোমার কপালে লাল, আর দীন-দরিদ্রের প্রেম।
সে-কোন্ গোত্রের মন্ত্রে বলো বধূ তোমাকে বরণ
করে এই ঘরে তুলি ? আমার তো কপিলে বিশ্বাস,
প্রেম কবে নিয়েছিলো ধর্ম কিংবা সংঘের শরণ ?
মরণের পরে শুধু ফিরে আসে কবরের ঘাস।
যতক্ষণ ধরো এই তাম্রবর্ণ অঙ্গের গড়ন
তারপর কিছু নেই, তারপর হাসে ইতিহাস।

আমার ঘরের পাশে ফেটেছে কি কার্পাশের ফল ?
গলায় গুঞ্জার মালা পরো বালা, প্রাণের শবরী,
কোথায় রেখেছো বলো মহুয়ার মাটির বোতল
নিয়ে এসো চন্দ্রালোকে তৃপ্ত হয়ে আচমন করি।
ব্যাধের আদিম সাজে কে বলে যে তোমাকে চিনবো না
নিষাদ কি কোনদিন পক্ষিণীর গোত্র ভুল করে ?
প্রকৃতির ছদ্মবেশ যে-মন্ত্রেই খুলে দেন খনা
একই যাদু আছে জেনো কবিদের আত্মার ভিতরে।
নিসর্গের গ্রন্থ থেকে, আশৈশব শিখেছি এ-পড়া
প্রেমকেও ভেদ করে সর্বভেদী সবুজের মূল,
চিরস্থায়ী লোকালয় কোনো যুগে হয়নি তো গড়া
পারেনি ঈজিপ্ট, গ্রীস, সেরাসিন শিল্পীর আঙুল।
কালের রেঁদার টানে সর্বশিল্প করে থর থর
কণ্টকর তার চেয়ে নয় মেয়ে কবির অধর।

৬

মাৎস্যন্যায়ে সায় নেই, আমি কৌম সমাজের লোক
সরল সাম্যের ধ্বনি তুলি নারী তোমার নগরে,
কোনো সামন্তের নামে কোনদিন রচিনি শোলোক
শোষকের খাড়া ঝোলে এই নগ্ন মস্তকের 'পরে।
পূর্ব পুরুষেরা কবে ছিলো কোন সম্রাটের দাস
বিবেক বিক্রয় করে বানাতেন বাক্যের খোয়াড়,
সেই অপবাদে আজও ফুঁসে ওঠে বঙ্গের বাতাস।
মুখ ঢাকে আলাওল—রোসাঙ্গের অশ্বের সোয়ার।
এর চেয়ে ভালো নয় হয়ে যাওয়া দরিদ্র বাউল ?
আরশি নগরে খোঁজা বাস করে পড়শী যে জন
আমার মাথায় আজ চূড়ো করে বেঁধে দাও চুল
তুমি হও একতারা, আমি এক তরুণ লালন,
অবাঞ্ছিত ভক্তিরসে এ যাবৎ করেছি যে ভুল
সব শুদ্ধ করে নিয়ে তুলি নব্য কথার কূজন।

৭
হারিয়ে কানের সোনা এ-বিপাকে কাঁদো কি কাতরা ?
বাইরে দারুণ ঝড়ে নুয়ে পড়ে আনাজের ডাল,
তস্করের হাত থেকে জেয়র কি পাওয়া যায় ত্বরা—
সে কানেট পরে আছে হয়তো বা চোরের ছিনাল !
পোকায় ধরেছে আজ এ দেশের ললিত বিবেকে
মগজ বিকিয়ে দিয়ে পরিতৃপ্ত পণ্ডিত সমাজ।
ভদ্রতার আবরণে কতদিন রাখা যায় ঢেকে
যখন আত্মায় কাঁদে কোনো দ্রোহী কবিতার কাজ ?
ভেঙো না হাতের চুড়ি, ভরে দেবো কানের ছেদুর
এখনো আমার ঘরে পাওয়া যাবে চন্দনের শলা,
ধ্রুপদের আলাপনে অকস্মাৎ ধরেছি খেউড়
ক্ষমা করো হে অবলা, ক্ষিপ্ত এই কোকিলের গলা।
তোমার দুধের বাটি খেয়ে যাবে সোনার মেকুর
না দেখার ভান করে কত কাল দেখবে, চঞ্চলা ?
৮
অঘোর ঘুমের মধ্যে ছুঁয়ে গেছে মনসার কাল
লোহার বাসরে সতী কোন ফাঁকে ঢুকেছে নাগিনী,
আর কোনদিন বলো, দেখবো কি নতুন সকাল ?
উষ্ণতার অধীশ্বর যে গোলক ওঠে প্রতিদিনই।
বিষের আতপে নীল প্রাণাধার করে থরো থরো
আমারে উঠিয়ে নাও হে বেহুলা, শরীরে তোমার,
প্রবল বাহুতে বেঁধে এ-গতর ধরো, সতী ধরো,
তোমার ভাসানে শোবে দেবদ্রোহী ভাটির কুমার।
কুটিল কালের বিষে প্রাণ যদি শেষ হয়ে আসে,
কুন্তল এলিয়ে কন্যা শুরু করো রোদন পরম।
মৃত্যুর পিঞ্জর ভেঙে প্রাণপাখি ফিরুক তরাসে
জীবনের স্পর্ধা দেখে নত হোক প্রাণাহারী যম,
বসন বিদার করে নেচে ওঠো মরণের পাশে
নিটোল তোমার মুদ্রা পাল্টে দিক বাঁচার নিয়ম।

যে বংশের ধারা বেয়ে শ্যাম শোভা ধরেছো, মানিনী
একদা তারাই জেনো গড়েছিলো পুণ্ড্রের নগর
মাটির আহার হয়ে গেছে সব, অথচ জানিনি
কাজল জাতির রক্ত পান করে বটের শিকড়।
আমারও নিবাস জেনো লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে
পূর্বপুরুষেরা ছিলো পাট্টিকেরা পুরীর গৌরব,
রাক্ষসী গুল্মের ঢেউ সবকিছু গ্রাস করে এসে
ঝিঁঝির চিৎকারে বাজে অমিতাভ গৌতমের স্তব।
অতীতে যাদের ভয়ে বিভেদের বৈদিক আগুন
করতোয়া পার হয়ে এক ইঞ্চি এগোতো না আর,
তাদের ঘরের ভিতে ধরেছে কি কৌটিল্যের ঘুণ ?
ললিত সাম্যের ধ্বনি ব্যর্থ হয়ে যায় বার বার ঃ
বর্গীরা লুটছে ধান নিম খুনে ভরে জনপদ
তোমার চেয়েও বড়ো হে শ্যামাঙ্গী, শস্যের বিপদ।

১০

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবি সাম্যের দাওয়াত
তাঁদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।
তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ,
শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশী ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ,
সলাজ সাহস নিয়ে ধরে আছি পট্টময় শাড়ি
সুকণ্ঠি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।

১১

আবাল্য শুনেছি মেয়ে বাংলাদেশ জ্ঞানীর আতুড়
অধীর বৃষ্টির মাঝে জন্ম নেন শত মহীরুহ,
জ্ঞানের প্রকোষ্ঠে দেখো, ঝোলে আজ বিষণ্ণ বাদুড়
অতীতে বিশ্বাস রাখা হে সুশীলা, কেমন দুরূহ ?
কী করে মানবো বলো, শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি এই
শীলভদ্র নিয়েছিলো নিঃশ্বাসের প্রথম বাতাস,
অতীতকে বাদ দিলে আজ তার কোনো কিছু নেই
বিদ্যালয়ে কেশে ওঠে গুটিকয় সিনানথ্রোপাস।
প্রস্তর যুগের এই সর্বশেষ উল্লাসের মাঝে
কোথায় পালাবে বলো, কোন ঝোপে লুকোবে বিহ্বলা ?
স্বাধীন মৃগের বর্ণ তোমারও যে শরীরে বিরাজে
যখন আড়াল থেকে ছুটে আসে পাথরের ফলা,
আমাদের কলাকেন্দ্রে, আমাদের সর্ব কারুকাজে
অস্তিবাদী জিরাফেরা বাড়িয়েছে ব্যক্তিগত গলা।

১২

নদীর সিকস্তী কোনো গ্রামাঞ্চলে মধ্যরাতে কেউ
যেমন শুনতে পেলে অকস্মাৎ জলের জোয়ার,
হাতড়ে তালাশ করে সঙ্গিনীকে, আছে কিনা সেও
যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার।
অন্ধ আতঙ্কের রাতে ধরো ভদ্রে, আমার এ-হাত
তোমার শরীরে যদি থেকে থাকে শস্যের সুবাস,
খোরাকির শত্রু আনে যত হিংস্র লোভের আঘাত
আমরা ফিরাবো সেই খাদ্যলোভী রাহুর তরাস।
নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষাণ
যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাই অধিকার তার,
তোমার মস্তকে তেমনি তুলে আছি ন্যায়ের নিশান
দয়া ও দাবীতে দৃঢ় দীপ্তবর্ণ পতাকা আমার :
ফাটানো বিদ্যুতে আজ দেখো চেয়ে কাঁপছে ঈশান
ঝড়ের কসম খেয়ে বলো নারী, বলো তুমি কার ?

১৩

লোবানের গন্ধে লাল চোখ দুটি খোলো রূপবতী
আমার নিঃশ্বাসে কাঁপে নকশাকাটা বস্ত্রের দুকূল,
শরমে আনত কবে হয়েছিলে বনের কপোতী ?
যেন বা কাঁপছো আজ ঝড়ে পাওয়া বেতসের মূল ?
বতাসে ভেঙেছে খোঁপা, মুখ তোলো, হে দেখনহাসি
তোমার টিকলি হয়ে হৃদপিন্ড নড়ে দুরু দুরু
মঙ্গলকুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী
উঠোনো বিন্নীর খই, বিছানায় আতর, অগুরু।
শুভ এই ধানদুর্বা শিরোধার্য করে মহিয়সী
আবরু আলগা করে বাঁধো ফের চুলের স্তবক,
চৌকাঠ ধরেছে এসে ননদীরা তোমার বয়সী
সমানত হয়ে শোনো সংসারের প্রথম সবক।
বধূবরণের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকুল
গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল, কবুল।

১৪

বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই
দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর,
লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই
হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর।
কথার খেলাপ করে আমি যদি জবান নাপাক
কোনদিন করি তবে হয়ো তুমি বিদ্যুতের ফলা,
এ-বক্ষ বিদীর্ণ করে নামে যেন তোমার তালাক
নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা।
রাতের নদীতে ভাসা পানিউড়ী পাখির ছতরে,
শিষ্ট ঢেউয়ের পাল যে কিসিমে ভাঙে ছল ছল
আমার চুম্বন রাশি ক্রমাগত তোমার গতরে
ঢেলে দেবো চিরদিন মুক্ত করে লজ্জার আগল,
এর ব্যতিক্রমে বানু এ-মস্তকে নামুক লানৎ
ভাষার শপথ আর প্রেমময় কাব্যের শপথ।

আত্মীয়ের মুখ

আহমেদুর রহমান স্মরণে

কেউ কেউ আছেন মনে, যেন কোনো আত্মীয়ের মুখ
বুকের ভেতর থেকে হেসে ওঠে, মৃদু শব্দে জিজ্ঞাসে কুশল
আর আমি আমার চেয়ার ছেড়ে নৈশব্দের মধ্যে হেঁটে গিয়ে
নতুন সিগ্রেটকেস খুলে ধরে বলি,
যেখানে গেলেন সেখানে রয়েছে নাকি অবসান ?—
আমাদের এই দীন সামান্য জগতে
মনুষ্যভাষার কোষে, কয়েকটি অলীক শব্দে
আছে যার দয়ার্দ্র কলাপ !
বইয়ের দোকান যদি নেই, কেনো তবে সেখানে গমন ?
সকালে সংবাদপত্র, রাজনীতি, ক্ষুব্ধ খোঁচাখুঁচি
যা কিনা রক্তাক্ত শার্টের মতো পরে আছে আমাদের ভয়ার্ত শতক—
এসবের ঊর্ধ্বে আজ বিনাবাক্য ব্যয়ে
কি করে থাকেন ?

জানিনা, দেশের খবর কিছু পান কিনা,
কি ঘটবে এশিয়ায়—এ নিয়ে তর্ক করে আপনার যাওয়ার পর
পৃথিবীর সবকটি শাদা কবুতর
ইহুদী মেয়েরা রেঁধে পাঠিয়েছে মার্কিন জাহাজে।

তরঙ্গিত প্রলোভন

পীরের মাজারে বসে কোনো রাতে বাউলের দল
যেমন হঠাৎ ধরে হু হু শব্দে প্রেমের জিকির
আমার কবিতা সেই মত্তদের রাতের গজল
তোমার শ্রবণে দিক কলজে ছেঁড়া কথার তিমির।

অস্তিক সম্মান যদি পায় কোনো শূন্যের পূজারী
সাকার রূপের ভক্ত কেন তবে ঘৃণার্হ বলো না ?
আমার সম্মুখে তুমি বিদ্যাধরী দ্রাবিড় কুমারী
মুক্ত করে দাও গাঢ় মহাকৃষ্ণ কান্তির ছলনা।

নদীর গভীর থেকে কতদিন বাতি জেবলে ধরে
গঞ্জের দালাল ভেবে ডেকেছিল ভরার কুটিলা
তরঙ্গিত প্রলোভন ক্রমাগত বুকে এসে পড়ে
টান করে ধরে আছি এক দীপ্ত ধনুকের ছিলা।

কে বিদ্রোহী আলো জ্বালো দীর্ণ জনপদে ?
আমাকে দেখাও মুখ অন্ধকার রাত্রির বিপদে।

তোমার আড়ালে

কোথাও রয়েছে ক্ষমা, ক্ষমার অধিক সেই মুখ
জমা হয়ে আছে ঠিক অন্তরাল আত্মার ওপর।
আমার নখের রক্ত ধুয়ে গেলে
যেসব নদীর জল লাল
হয়ে যাবে বলে আমি দিশেহারা
আজ সে পানির ধারা পাক খেয়ে নামে
আমার চোখের কোণে
আমার বুকের পাশ ঘেষে।
তোমার আড়ালে দেখি ঢেকে যায় আমার নিবাস
শরীর, স্বাস্থ্যের দীপ্তি, পৌরুষের চিহ্ন কতিপয়
ঢেকে যায় গাছপালা পতঙ্গ উদ্ভিদ
এমন কি নারীর মুখ, কান্তিময়
মাংসের কপাট।

ঢেকে যায় কাব্যহিংসা, পক্ষপাত
শিল্পের আসন।
তোমার আড়ালে পড়ে থাকে
মৃত্যুভয়,
কালজ্ঞ কবির বৈভব।

ভাগ্যরেখা

সামনে দেখি গর্ত এক রয়েছে বড়ো হা করে
আমার দিকে, দেখি, নিগূঢ় আঘাতে ;
জীবন যেন জালের মাছি টান্‌ছে কালো মাকড়ে
কোনো কিছুই পারেনা তারে জাগাতে।

তাহলে আমি জেনেছি এই, আমার প্রাণ ঝলকের
যা কিছু ছোঁয় দেখেছি সবি ঝালিয়ে ;
বয়স করে তাড়া ভীষণ জীবন নাকি পলকের
শহর থেকে শহরে আসি পালিয়ে।

প্রেমের কাছে থেমেছিলাম, গরীব সেই অসতী—
আপন মনে দিচ্ছে টান বিড়িতে,
সেওতো এক বিরাণ নারী, গুড়িয়ে যাওয়া বসতি,
ছিলাম যার দর্‌গাহের সিঁড়িতে।

লোভের লতা বাড়েনি মনে, ভূমিতে সেই চাষও না
যা দিয়ে যায় ভাগ্যরেখা নাড়ানো ;
যেখান থেকে এসেছিলাম অতীত সেই বাসনা
পাবো কি তারে শেমিজ খুলে দাঁড়ানো ?

শোণিতে সৌরভ

তোমার মুখ আঁকা একটি দস্তায়
লুটিয়ে দিতে পারি পিতার তরবারি
বাগান জোত জমি সহজে, সস্তায়
তোমার মুখ আঁকা একটি দস্তায় ;
পরীর টাকা পেলে কেউ কি পস্তায় ?
কে নেবে তুলে নাও যা কিছু দরকারী,
তোমার মুখ আঁকা একটি দস্তায়
বিলিয়ে দিতে পারি পিতার তরবারি।

তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল
শোণিতে মেশালো কি মধুর সৌরভ ?
প্রতিটি দিন যায় আহত, নিষ্ফল
তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল,—
ঈভের মতো আজ হওনা চঞ্চল
আমার ডানহাতে রাখো সে গৌরব ;
তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল
শোণিতে মেশালো কি মধুর সৌরভ।

তোমার নাভি দেখে হাঁটছি একা আমি
দেবে কি গুল্মের কৃষ্ণ সানুদেশ ?
যেখানে পাখি নেই রক্ত দ্রুতগামী
তোমার নাভি দেখে হাঁটছি একা আমি
মধ্যযুগী এক যুবক গোস্বামী
দেহেই পেতে চায় পথের নির্দেশ ;
তোমার নাভিমূলে দেখেছি একা আমি
নরম গুল্মের কৃষ্ণ সানুদেশ।

গোপন রাত্রির কোপন যাদুকর
আমার করতলে রেখেছে অগ্নি,
পুড়িয়ে এসেছি তো যা ছিল নির্ভর
গোপন রাত্রির কোপন যাদুকর—
দেখালো সেই মুখ দারুণ সুন্দর
জেনেছি কে আমার কৃপণ ভগ্নি ;
গোপন রাত্রির কোপন যাদুকর
আমার করতলে জ্বেলেছে অগ্নি।

কনক জঙ্ঘার বিপুল মাঝখানে
রচেছো গরিয়সী এ কোন দর্প ?
আকুল বাঁশরীর অবশ টানে টানে
কনক জঙ্ঘার বিপুল মাঝখানে,
আবাস ছেড়ে আমি আদিম উত্থানে
ধরেছি ফণা নীল আহত সর্প,
কনক জঙ্ঘার বিপুল মাঝখানে
মেলেছো গরিয়সী এ কোন দর্প।

সাহসের সমাচার

কাজী নজরুল ইসলামকে

সাহসের সমাচার শেষ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে
          হে কবি, একদা

ভেসে যেতে যেতে কালো তোমার চুলের মত মেঘ
বড়ো অনুরোধ করে, রক্তের ওপারে যেতে প্ররোচনা দিতো,
কারাগার ভেদ করে দাঁড়াতো দণ্ডিত।
          পথে এসো, বলে
প্রকাণ্ড প্রাচীন মুখে গাওয়া হতো ধ্বংসের ধ্রুপদ।

বিপ্লব বিপ্লব বলে হে মিথ্যার মোহন কোকিল

বাংলার শীতল রক্তে তুলে দিয়ে খারাপ ঝংকার
নিসর্গের স্তনে যেনো কালো এক তিল হয়ে গেলে !

আজ তাই শাস্তি নাও কবিবর। নাও এ-হলুদ
শুকনো মাংসের স্তূপ। ঢাকো প্রেম মলিন চাদরে
যেন না গড়ায় রস সংক্রামক পারার নিঃসার।
অথবা বধির হও, যেনো কোনো সঙ্গীতের স্বেদ
না জমে ললাটে আর একবিন্দু। এখন সটান
শুয়ে পড়ো নিয়তির তীরবিদ্ধ মত্ত বাজপাখি।

চোখ

এখন চোখ নিয়েই হলো আমার সমস্যা। যেন
আমি জন্ম থেকেই অতিরিক্ত অবলোকন শক্তিকে
ধারণ করে আছি।

প্রতিটিবস্তুর বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে।
মানুষ যখ্য কোনো বর্ণের বিবরণ দান করে
আমি বুঝতে চেষ্টা করি।
আমি বুঝতে পারিনা তোমরা কী করে
কোনো রঙিন জিনিসের নাম নির্ধারিণ কিম্বা
শস্যক্ষেত্র দেখে আপ্লুত হয়ে বলে ওঠো—
সবুজ, সবুজ !
আমি যখন সবুজের দিকে তাকাই
সে আর সবুজ থাকে না। আমি
গলিত মথিত সবুজের সাথে
নিজেকেও সবুজাভ দেখি।
আমার স্ত্রী সবুজ হয়ে যান, ছেলেদের
সবুজ বলে মনে হয়।
যে মেয়েটি নীল ফ্রক পরে বারান্দায় খেলে
সেও যেন সবুজ প্রজাপতি।

তারপর শুরু হয় সবুজের পীড়ন।
সবুজ আমার চোখে আঘাতের মত বাজতে থাকে
আমার চোখে তখন সবুজকে লাল বলে মনে হয়।
সে লাল আবার নীল হয়ে যায়। তারপর কালো।
এইভাবে শতবর্ণে রঞ্জিত হতে হতে
শাদা এসে সব কিছুকে ঢেকে ফেলে। আমার
চোখ তৃপ্ত হতে থাকে। আমি তখন
স্ত্রীকে দেখি না, পুত্রকন্যাকে দেখি না।

না, আমি দৃষ্টিবিভ্রমের কথাও বলছি না।
আমার চোখে কোন অসুখ নেই। ডাক্তার ওদুদ
আমার চশমার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না।
সম্ভাব্য দূরত্ব থেকে আমি প্রতিটি অক্ষর
ঠিকমত পড়তে পারি।

আমি এক সময় সংবাদপত্রে প্রুফরিডার ছিলাম।
প্রতিটি আকার ই-কারের অনুপস্থিতি এখনও
আমার চোখ লাগে। তবু কেন এরকম হচ্ছে
কে আমাকে বলে দেবে ?
আমি কেন প্রতিটি রংয়ের ভিতর
অন্য রংকে দেখতে পাই।

উল্টানো চোখ

এইতো সেই অবসর, যখন কোনো দৃশ্যই আর গ্রাহ্য নয়।
পলকহীন চোখ যেন উল্টে যাচ্ছে। যেখানে থরে থরে সাজানো আছে
ঘটনার বিদ্যুচ্চমক। না, কাউকে ধমক দিতে চাইনা।
কোনো কর্তব্য আমার জন্যে নয়। বরং হৃদয়ের ভেতর
যে ব্রহ্মান্ডকে বসিয়ে রেখেছি তার গোলক
দ্রুত আবর্তিত হোক।
ভিয়েতনামে বোমা পড়ছে। আমি তার প্রতিবাদ করি।

আমার উল্টানো চোখ যেন খুশি ভ্রমণে উদগ্রীব।

এমনকি মেয়েরা যখন কলতলায় শাড়ি পাল্টায়,
আমার চোখ নির্লজ্জের মত দ্রুত দেখে নেয়।
সাত পাট কাপড় যেখানে কাচের মত স্বচ্ছ
কে আর আমাকে অন্ধ করতে পারবে ?

আমার চোখ দৃষ্টব্যের উল্টো দিকে ফেরানো
সেখানে ফালতু আবরণ উঠে গিয়ে আসল বেরিয়ে পড়ে।
কেউ বক্তৃতা করলে
আমি শুনতে পাই না।
বরং বক্তার জিভের ওপর
তার আত্মাকে দেখতে পাই। কেউ সেজদায় নত হলে
আমি দেখি একটি কলস ভরা লোভ উবুড় হয়েছে।

পরিচিত অপরিচিত মেয়েরা এখন আমার সামনে না-আসুক
কারণ তাদের ঢাকাঢাকি বড়ো বেশী। আর

আমার চোখে এখন আবরণের অস্তিত্ব নেই।
এখন আমার মনের মধ্যে রয়েছে এক শিল্পীর একক প্রদর্শনী।
সবাই তার বর্ণলেপনের পারদর্শিতা নিয়ে গল্প-গুজব করুন,
কিন্তু আমি সমস্ত বিমূর্ততাকে ভেদ করে দেখলাম
এক বেকার নিরপরাধ কামুক বেশ্যার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে।
যে মেয়েটি বুকে হাত রাখলে খদ্দেরদের ভীষণ ধমকাতো।

আমার ঘরে একজন জাতীয় নেতার ছবি রয়েছে
আমি সেদিকে তাকাতে ভয় পাই।
একবার সেদিকে চোখ পড়লেই ছবিটা
পঁচিশে মার্চের রাত্রি হয়ে যায়।
পারতপক্ষে আমি নিজের দিকেও তাকাই না।
বিশ্রী রেখাবহুল পোর্ট্রেট। একবার চোখ পড়লেই ছবিটা
কাঁপতে কাঁপতে এক বড়োসড়ো গ্রাম হয়ে যায়।
এঁদো ডোবা। কচুরিপানার ওপর বেগনি ফুল। নেবুপাতার
ভেতর দিয়ে ধাবমান বাতাস। গোবরের গন্ধ। কোকিল। পাটখেতে
দমবন্ধ গরমের মধ্যে মুল্লাবাড়ীর সবচেয়ে রূপসী মেয়েটিকে
চুমু খাওয়া।
এই তো আমার মুখ ভাইসব, এইতো আমার মুখ !
আমার মুখচ্ছবির মধ্যে এইতো চারজন যুবক প্রবেশ করলো।
কচুরিপানার শিকড়ের মত কালো উজ্জ্বল দাড়ি। দুমড়ানো
পোশাক। যারা সর্বশেষ আহ্বানে হৃদয়ের ভেতর
অস্ত্র জমা রেখেছে। এখন আমার মুখের ভেতর তাদের
গুপ্ত অধিবেশন। যে অতর্কিতে
শহরগুলোকে দখল করা হবে
আমার মুখ তারি রক্তাক্ত পরিকল্পনা।

আভূমি আনত হয়ে

এ ঘুরে দাঁড়ানো নয়, শুধু আভূমি আনত হয়ে থাকা
দৃশ্যের আঘাত থেকে মুদে রাখা চোখের প্রতিভা।
চোখ বড় সাংঘাতিক রক্তের প্রান্তর ছুঁয়ে থাকে—
নিসর্গ নিবন্ধ করে দেখে নেয় নারী আর নদীর নিতল।
ধরে রাখে মাছ পাখি পশু আর পতঙ্গের প্রসঙ্গ সকল
সমস্ত সম্বন্ধসূত্র ভেদ করে আনে তীব্র চাক্ষুষ প্রমাণ।

আমার মস্তিষ্কে নয়
আমার কৈশোর বুঝি বসে আছে চোখের ভিতরে
বিশাল ধনুক হাতে ক্লান্ত এক সবুজ বালক।

অথচ এ-দৃষ্টিগ্রাহ্য আওতায় আমার
আমারি ছেলেকে দেখি টেরি কাটে ঘুরিয়ে দর্পণ।
কে জানে আমিই কিনা, কিম্বা ঠিক আমিই রয়েছি
ফিরিয়ে দিচ্ছি চুল সোজাসুজি তালুর ওপর।
সটানে পরেছি মোজা, ঘষে নিয়ে হাতার বোতাম
ব্রাশ চালিয়েছি জোরে—বুঝিবা স্তিমিত গ্লাসকীড
চল্লিশ বছর থেকে ঝেড়ে ফেলবে বাপের বয়স।

চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়

আমার চোখ যখন অতীতাশ্রয়ী হয়, তখনি আমার ভয়।
মনে হয় চোখ যেন আস্তে আস্তে কানের দিকে সরে যাচ্ছে।
কিম্বা শ্রবণেন্দ্রীয় এসে আমার চোখের ভেতর
শব্দের রাজদণ্ড ধরেছে।
যেদিকে তাকাই, শুধু শুনতে পাই। শুনতে পাই
দূরাগত ভাঙনের শব্দ। যেন বিশাল চাঙড়
ভেঙে পড়ছে কোথাও। আর ছিটকে পড়া জলের কণায়
আমি আর চোখ মেলতে পারি না।

আমি যখন ছোটো, আমাদের গ্রাম ছিল
এক উদ্দাম নদীর আক্রোশের কাছে। ক্রমাগত ভাঙনের রেখা
ধীরগতিতে গ্রামকে উজাড় করে এগোতে থাকলে
আমি প্রাত্যহিক ভাঙনের খবর আমার মাকে এনে দিতাম।
দৌড়ে এসে বলতাম, আজ ইদ্রিসদের
গোয়াল ঘরটা গেল মা।

আমার বাপের ছিল অঘুমের অসুখ। সারারাত
ধসনামার শব্দ পোহাতেন। কখনো দেখতাম
সড়কি নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছেন।
আমি তার পেছন নিলে বলতেন, আয়
কোথায় চর জাগলো দেখে আসি।
দশ মাইলের মধ্যে চরের খবর মাঝিরা কেউ জানতো না।
গলুইয়ের ওপর থেকে হাত নেড়ে নেড়ে
তারা দূর গঞ্জের দিকে চলে গেলে
আমরা ঘরে ফিরতাম !

ভাঙন যখন চল্লিশ গজের মধ্যে এগোলো। আমার বাপ
তখন অসুস্থ। কি তার অসুখ ছিল জানি না,

কেবল আমাকে নদীর কাছে যেতে বলতেন। বলতেন
জেনে আয় কোন দিকে চর পড়েছে।
আমি তার কথায় দৌড় দিতাম। কিন্তু ফিরে এসে বলতাম
আজ কৈবর্তপাড়ার নলিনীদের ভিটেবাড়ী ভাঙলো বাবা।

মা চোখ টিপতেন। কিন্তু আমি তো ছিলাম শিশু
যে মিথ্যা বলতে শেখেনি। একদিন এ-ভাবেই
সব শেষ হয়ে গেল।

যেদিন নদী এসে আমাদের বাড়ীটাকে ধরলো
সেদিনের কথা আমার চোখের ওপর স্থির হয়ে আছে।
বাক্সপেটরা থালা ঘটিবাটি নিয়ে আমরা
গাঁয়ের পেছনে বাপের কবরে গিয়ে দাঁড়ালাম।
জায়গাটা ছিল উঁচু আর নিরাপদ। দেখতে
অনেকটা চরের মতই। মা সেখানে বসে
হাঁপাতে লাগলেন। কাঁদলেন এমন ভাবে যে
অভিযোগহীন এমন রোদন ধ্বনি বহুকাল শুনিনি আমি।

তারপর ভাঙনের রেখা পেছনে রেখে
আমরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছিতড়ে পড়লাম।
কেউ গেলাম মামুর বাড়ীতে। কেউ ফুপুর। যেমন
বাবেল থেকে মানুষের ধারা
ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীতে।

আমার চোখের তলদেশে

একদা এমন ছিল যে, আমার চোখই ছিল সমস্ত দুঃখের আকর।
এমন কি একটা করুণ উপন্যাসও পড়তে পারতাম না আমি।
বুক ঠেলে কান্না উঠে আসতো চোখে। গাল বেয়ে নামতো ধারাজল।
উপচানো চোখ নিয়ে আমি লজ্জায় মুখ লুকাতাম।
একটা সামান্য বই নিয়ে আমার এ অবস্থা দেখে
পড়ার টেবিলে বোনেরা পাথর হয়ে যেতো। আম্মা
থমকে দাঁড়াতেন। আর আব্বা ঘরে থাকলে
সোজাসুজি বিহ্বলদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে
কি যেন ভাবতে ভাবতে মসজিদে চলে যেতেন।

কিন্তু তাদের চোখ থাকতো সর্বদাই নির্জলা পাথর।

দুঃখ পেলে তারা একেবারেই কাঁদতেন না, এমন নয়।
সন্তপ্ত অথবা সন্তানহারা হলে তারাও কাঁদতেন। তাদের
চোখও ফেটে যেতো। একবার আমার কনিষ্ঠতমা বোন
নিউমোনিয়ায় মারা গেলে আম্মা অনেকদিন
কেঁদেছিলেন। সে কান্না, আমি ভুলিনি।

আমার মাকে শোকাভিভূতা ভাবলেই, দৃশ্যটি
চেখের ওপর এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আবহমান কালের মধ্যে
তারা ছিলেন বাষ্পহীন। নির্জল, নির্মেঘ।

আমার কৈশোর আমাকে আর্দ্র করে রেখেছিল।
আর আমার চোখ ছিল গ্লাসে ভিজানো
ইছবগুলের দানার মত জলভরা।

এখন সবকিছুই পাল্টে গেছে।
যে চোখ ছিল ঝিলের ভিতর উত্থিত ফোয়ারার মত।
এখন তার তলদেশে চকচকে বালি।

আজকাল আমার মার সাথে কদাপি দেখা হয়।
মাঝে মাঝে আসেন। গ্রাম থেকে নিয়ে আসেন সরু চাল।
গাঁওয়া ঘি। খাঁটি সর্ষের তেল আর বিশুদ্ধ অনুতাপময় কান্না।

তার ধারণা শহরের ভেজালে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে।
আমার ছেলেরা ঠিকমত বাড়ছে না।
যেমন আমি ভাবি, গ্রাম থেকে শুদ্ধ মানুষের স্রোত এসে
একদিন শহর দখল করে নেবে। তেমনি।

আমরা দুদিক থেকে দু'জনকে দেখি।
আমার মার শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ
একবার ভাইয়ের বিরুদ্ধে। একবার বোন আর
বহমান কালের বিরুদ্ধে। তারপর
অবিরল কান্না।

আমার বাপ নেই। থাকলে
তিনিও কি কাঁদতেন ?

তবু আমার জননী বাষ্পাকুল চোখে কেন আমার
চোখের দিকেই তাকিয়ে থাকেন ?
আমি অবশ্য সান্ত্বনাচ্ছলে তাকে ধমক লাগাই।
তার কান্না থামেনা।
তাকে সংসার চালাবার মত টাকা দিই। কিন্তু
আমার চোখ শুকনো থাকে। যেন
সকালের সংবাদপত্রের দু'টি জাজ্বল্যমান
আন্তর্জাতিক হেডলাইন।

ক্যামোফ্লাজ

নিজেকে বাঁচাতে হলে পরে নাও হরিৎ পোশাক
সবুজ শাড়িটি পরো ম্যাচ করে, প্রজাপতিরা যেমন
জন্ম-জন্মান্তর ধরে হয়ে থাকে পাতার মতন।
প্রাণের ওপরে আজ লতাগুল্ম পত্রগুচ্ছ ধরে
তোমাকে বাঁচাতে হবে হতভম্ব সন্ততি তোমার।

নিসর্গের ঢাল ধরো বক্ষস্থলে
যেন হত্যাকারীরা এখন
ভাবে বৃক্ষরাজি বুঝি
বাতাসে দোলায় ফুল
অবিরাম পুষ্পের বাহার।

জেনো, শত্রুরাও পরে আছে সবুজ কামিজ
শিরস্ত্রাণে লতাপাতা, কামানের ওপরে পল্লব
ঢেকে রেখে
নখ
দাঁত
লিঙ্গ
হিংসা
বন্দুকের নল
হয়ে গেছে নিরাসক্ত বিষকাটালির ছোটো ঝোঁপ।

বাঁচাও বাঁচাও বলে
এশিয়ার মানচিত্রে কাতর
তোমার চিৎকার শুনে দোলে বৃক্ষ
নিসর্গ, নিয়ম।

আমার অনুপস্থিতি

আমার অনুপস্থিতি হাই তোলে মার্চের গুমোট বাতাসে
কে ভাবতো, খৃষ্টাব্দের শেষ রবিবারও যাবে নিঃসঙ্গ এমন।
অথচ ফিরি না আমি, তোমার খোঁপার ফুল ঝরে যায় পিঠে
চায়ের সরঞ্জাম তুমি তুলে নাও, ভাবো,
শাড়িটা পাল্টে নিয়ে শুয়ে থাকবে কিনা নীচে দক্ষিণের ঘরে।
আর আমি, প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীদের মতো পরেছি পোশাক
যেন সব ভুলে গেছি, কোনোকালে কাউকে কখনো
বলিনি আসবো ফিরে—ঘরে থেকো, বারান্দায় বসবো দু'জন।

এখনো অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে
আমার পছন্দ মত শাড়ি কোনো নারী পরেছে কখনো।
আমি ভালোবাসি নদী, তাই হাসতে হাসতে সেও
হয়ে যেতো নদী।
নিসর্গের নীতি তাকে বোঝাতে গেলেই,
আহা তুমি গাছ হও যদি—
আমার আদেশ শুনে অমনি সে
এই দেখো, এই বলে মেলে দিতো তার ডালপালা।
আজ প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারীদের মতো পরেছি পোশাক
আমার অনুপস্থিতি হাই তোলে মার্চের গুমোট বাতাসে।

কেবল আমার পদতলে

আমার জিজ্ঞাসা যেন ক্রমান্বয়ে কমে আসছে, আমি
অহরহ আর কাউকে প্রশ্নবাণে
বিব্রত করি না।
জানতে চাই না আজকাল
কেবল আমারি কেন পদতলে কেঁপে ওঠে মাটি।
কোথাও ভূকম্পন নেই। তবু কেন
তবু কেন
নগরকম্পনের জের চলতে থাকে
আমার শিরায়।

প্রশ্ন করি না—
যখন নড়ছে ঘর, ইমারত বসে যাচ্ছে
দেয়ালের ফাট
বিশাল হা-এর মত খুলে গিয়ে
মিশে যায় দৃষ্টির আড়ালে,
তোমরা কি ভাবে, বন্ধুগণ
খাড়া আছো ?
পৌর-প্রভাবের নীচে মন্ত্রপূত অশথের বীজ
আছে কি না-আছে
আমি আর জানতে চাই না।
কেবল লুতের মত সদোমের সিংহদরোজায়
প্রভু, অনিদ্রায়
আমি যেন থাকি।

নদী তুমি

কে অস্বীকারের পাখি ডানা ঝাড়ো আমার ভিতরে
বেয়াদব শিসে তোর ছলকে ওঠে রক্ত চলাচল ?
নিসর্গের মানচিত্র ছেঁদা করে একদা যে নদী
আনতো গভীর জল কর্মপরায়ণ ঘরে ঘরে
সেও আজ নদী নয়, কালসাপ, ধূর্ত বণিকের
গোপন দালাল যেন। পাটের চালান ভরা নাও
ভাসাও উদ্দাম গতি, হাসির গমকে নেড়ে পাল
পাটাতনে ভেঙে পড়ো বিশ্বাসঘাতক নীল জল।

একদিন আমাদের হবে। অজগর এই নদী
হবে জাগর ভাস্বর ঘোলা, হবে চঞ্চল তরল
পেশীতে মচকাবে দাঁড়, পালে আর দড়িতে বিদ্যুৎ

আজ আমাদেরও নও, শোষণে ধর্ষণে কালোরেখা।
যেন চোরের সাহায্যকারী তুমি, কবির সন্দেহ ;
বোনের শাড়ির মত মায়ের দেহের মত নও !

সত্যের দাপটে

আমাদের এ সংসার সত্য হয়ে ওঠে কি কখনো ?
তবু কেন সত্য সত্য বলা ?
সত্যের দাপটে যেন না ভাঙে এ-ঘরের দেয়াল।

খাটের বিছানাজুড়ে ঘুমিয়েছে যে গরিমা, তাঁর
দেখো চেয়ে বুক দুলছে, নিঃশ্বাসে কাঁপছে দু'টি বুক।
বাহুতে জমেছে ঘাম। কাতানের ওপরে বাতাস
আস্তে উড়িয়েছে পাড়। উরুর প্রান্তরে
একটি তিলের শোভা অনাবৃত হয়েছে দৈবাৎ।
তাকে কি জাগাতে চাও মহত্তম সত্য সংবাদে ?

তাহলে জাগিয়ে দেখো, উঠবে সে চোখে নদী নিয়ে
সত্যের বিদ্যুতে তার ঝলসে যাবে ঘরের পাঁচিল।
একটিমাত্র শিশুর কান্নায়
ছিঁড়ে যাবে টেলিফোন, পাখার ঘূর্ণন
অকস্মাৎ বেড়ে গিয়ে উল্টে দেবে লতাকুঞ্জময়
বৃদ্ধের মস্তকসহ ধাতুর পাখিটি।
আর পাড়ার লোকেরা—
প্রতিবেশী গৃহস্থের ঘরে অকস্মাৎ
সত্যের সৌন্দর্য দেখে
দমকল, দমকল বলে ছুটবে রাস্তায়।

আমি আর আসবোনা বলে

আর আসবো না বলে দুধের ওপরে ভাসা সর
চামোচে নিংড়ে নিয়ে চেয়ে আছি। বাইরে বৃষ্টির ধোঁয়া
যেন শাদা স্বপ্নের চাদর
বিছিয়েছে পৃথিবীতে।
কেন এতো বুক দোলে ? আমি আর আসবো না বলে ?
যদিও কাঁপছে হাত তবু ঠিক অভ্যেসের বশে
লিখছি অসংখ্য নাম চেনাজানা
সমস্ত কিছুর।

প্রতিটি নামের শেষে, আসবো না।
পাখি, আমি আসবো না।
নদী, আমি আসবো না।
নারী, আর আসবো না, বোন।

আর আসবো না বলে মিছিলের প্রথম পতাকা
তুলে নিই হাতে।
আর আসবো না বলে
সংগঠিত করে তুলি মানুষের ভিতরে মানুষ।
কথার ভেতরে কথা গেঁথে দেওয়া, কেন ?
আসবো না বলেই।
বুকের মধ্যে বুক ধরে রাখা, কেন ?
আসবো না বলেই।

অথচ স্মৃতির মধ্যে পরতে পরতে জমে আছে
দুঃখের অস্পষ্ট জল। মনে হয় যে নদীকে চিনি
সেও ঠিক নদী নয়, আভাসে ইঙ্গিতে কিছু জল।
যে নারী দিয়েছে খুলে নীবিবন্ধ লেহনে পেষণে
আমি কি দেখেছি তার পরিপূর্ণ পিঠের নগ্নতা ?

হয়তো জংঘার পাশে ছিল তার খয়েরী জরুল
লেহনলীলায় মত্ত যা আমার লোলিহান জিহ্বাও জানে না

আজ অতৃপ্তির পাশে বিদায়ের বিষণ্ণ রুমালে
কে তুলে অক্ষর কালো, 'আসবো না'
সুখ, আমি আসবো না।
দুঃখ, আমি আসবো না।
প্রেম. হে কাম, হে কবিতা আমার
তোমরা কি মাইল পোস্ট না ফেরার পথের ওপর ?

আঘ্রাণ

আজ এই হেমন্তের জলদ বাতাসে
আমার হৃদয় মন মানুষীর গন্ধে ভরে গেছে।
রমণীর প্রেম আর লবণসৌরভে
আমার অহংবোধ ব্যর্থ আত্মতুষ্টির ওপর
বসায় মর্চের দাগ, লাল কালো
কটু ও কষায়।

প্রতিটি বস্তুতে দেখি লেগে আছে চিহ্ন মানবীর
হাওয়ায়, জলের ঢেউয়ে, গুল্মের স্তবকে স্তবকে
বইছে নারী ঘ্রাণ কমনীয় যুগান্তসঞ্চারি।
গণ্ডুষে তুলেছি জল, টলমল—
কার মুখ ভাসে ?
কে যেন কিশোরী তুমি আমারি কৈশোরে
নেমেছিলে এ নদীতে। লেগে আছে
তোমারি আতর।

হে বায়ু, বরুণ, হে পর্জন্য দেবতা
তোমাদের অবিরল বর্ষণে ঘর্ষণে
যখন পর্বত নড়ে, পৃথিবীর চামড়া খসে যায়
তবু কেন রমণীর নুন, কাম, কুয়াশার
প্রাকৃতিক গন্ধ লেগে থাকে ?

হে বরুণ, বৃষ্টির দেবতা !

স্তব্ধতার মধ্যে তার ঠোঁট নড়ে

আমি জানতাম প্রত্যেক বিজয়ীদের জন্যে থাকে পুরস্কার।
যুদ্ধ ফেরত ক্লান্ত বীরদের পাওনা পুলকের প্রস্রবণ।
এমন কি আহত, পঙ্গুদের বুকেও সান্ত্বনার পদক ঝলকায়।
আর কে না জানে এসব তাদেরই প্রাপ্য। চিরকালই বীরত্বের
বিনিময়ে এরকম রেওয়াজ রয়েছে।

কিন্তু একজন কবিকে কি দেবে তোমরা? যে ভবিষ্যতের দিকে
দাঁড়িয়ে থাকে বিষন্ন বদনে? অঙুলি হেলনে যার নিসর্গও
ফেটে যায় নদীর ধারায়। উচ্চারণে কাঁপে মাঠ,
ছত্রভঙ্গ মিছিল, মানুষ, পাক খেয়ে এক হয়ে যায়।

যখন সে ফিরে, দেখে, আচ্ছন্ন উঠোন। সে দেখে
শিশুর শব নিস্পৃহ মায়ায়। সে দেখে ধর্ষিতার শাড়ি
ছিন্ন ভিন্ন, হত্যায় ছাপানো। স্তব্ধতার মধ্যে তার ঠোঁট নড়ে
ইতিবৃত্ত ভেঙে পড়ে রক্তবর্ণ অক্ষরের স্রোতে।

বোধের উৎস কই, কোনদিকে ?

আচ্ছন্ন চিন্তার মধ্যে স্তব্ধতায় অকস্মাৎ শুনি
সেলাই কলের চলা। পড়শী ঘরণী
বানায় শিশুর জামা।

হঠাৎ গুলির শব্দ। চিৎকার, ধর ধর ধর
কিন্তু আমি কাকে ধরবো ? স্টেনগান কাঁধে নিয়ে হেঁটে যায়
উনিশশো তেয়াত্তর সাল।
বাগান মাড়িয়ে দিয়ে জীপ যায়,
আবার গুলির শব্দ
মা..মা..মা জানালা বন্ধ করো
ঢোলফোন ঢোলফোন...
আবার গুলির শব্দ। বাঁচাও বাঁচাও...
বানাও শালকে ছিঁড়ে ফেলো—
...ট্যাট্...ট্যাট্...ট্যাট
খোল্ শালী চোরের চোদানী শাড়ি খোল্
...ট্যাট্...ট্যাট্...ট্যাট
ছেলে তুই. ছেলে তুই আমার ধর্মবাপ তুই...
...ট্যাট্...ট্যাট্...ট্যাট্

সেলাই কলের চলা থেমে গেছে। সব দরজা বন্ধ করে
জেগে আছি বাতাসের বিরুদ্ধে নীরব। এ-কেমন শিহরণ
গ্রীষ্মকে শীত আর শীতকেও গ্রীষ্ম করে দেয় ?
আমার কি জাড় আছে ? শরীর কি ভিজে গেলো ঘামে ?
বোধের উৎস কই, কোনদিকে ?
আমাকে রাখতে দাও হাত।
একবার স্পর্শ করি শিশ্নে, সহ্যগুণে, প্রেমে
রক্তের ভিতর দিয়ে একবার দেখা যায় যদি
বিশাল মিনার সেই, যাকে লোকে পুরুষার্থ বলে।

মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো

চক্রবর্তী রাজার অট্টহাসি

কাল আমি এক দুঃস্বপ্নের উপত্যকা পার হয়ে এসেছি। প্রথম মনে হয়েছিল
আমি কোনো উপত্যকা ভূমির ঘন ঘাস মাড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু হাঁটাপথের
চারপাশে ইতস্তত ইট আর কোনো প্রাসাদোপম অট্টালিকার
ধ্বংসাবশেষ দেখে, আমার ভুল ভাঙলো।
আমি দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তাকালাম। মনে হলো,
এক অভিশপ্ত নগরীর নির্জন রাজপথে আমি দাঁড়িয়ে আছি।
আমার ভয় হলো, অথচ মনে হলো বড়ো চেনা
কে আমাকে এখানে আনলো ? তবে কি আমি ভুল করে
রাতের অন্ধকারে অবলুপ্ত নগরী মহাস্থানগড়ের অভ্যন্তরে চলে এসেছি ?
ঝিঁঝির চিৎকারে আমার কান ঝালাপালা,
ভয় আর শীতে আমি কাঁপছি। জোনাক পোকার আলো
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মত আমার চুল, আমার মুখ, আর বুকের ওপর
স্পর্শ রাখছে।

আমি দৌড় মেরে পলাতে চাইলাম। আমার পা সরলো না।
আমার সামনে কবরের মত যে জায়গাটা ছিল,
সেখান থেকে ধমকের মত একটা শব্দ এসে আমাকে থামিয়ে দিল।
আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত কবরের দিকে এগোলাম।
যখন কবরের পাশে দাঁড়ালাম,
কবর আর কবর রইল না,
পৃথিবীর পেটের ভেতর সিঁড়ির মত একটা পথ দেখতে পেলাম।
কে যেন আমাকে বললো, 'যাও।'
আমি আশেপাশে তাকালাম, না, কাউকে দেখছি না।
আবার নির্দেশ হলো, 'যাও।'
ভয়ে আমি সিঁড়িতে পা দিলাম। আমার হৃদপিন্ড দুলছিল।
অন্ধকারে আমার চোখ অন্ধ। তবু আমি প্রতিটি ধাপ পেয়ে যাচ্ছি
পেরিয়ে যাচ্ছি।
আমি যখন থামলাম, তখন আর অন্ধকার ছিল না।

এক ধরনের আবছা আলোর মধ্যে এসে পড়েছি।
কেউ থামতে বলেনি, আমার মন বললো এখানে থামা উচিত।

আমার সামনে এক প্রাসাদ দেখলাম। মনে হলো, পুণ্ড্রবর্ধনের
প্রাচীন কোনো রাজবাড়ীর সিংহদরোজায় আমি দাঁড়িয়ে।
আমার কেনো জানি মনে হলো সূর্য ওঠার আগেই আমাকে
প্রাসাদে প্রবেশ করতে হবে, না হলে উপায় নেই।
আমি ভেতরে প্রবেশ করে দুয়ার ভেজিয়ে দিলাম।
দামী কার্পেটে পা ডুবিয়ে আমি ঘরের আসবাবপত্র দেখতে লাগলাম।
দারুশিল্পের এক অতীত জগতে এসে পড়েছি। আমার চারদিকে
মেহগনির আসনের ওপর রেশমের গদী। দেয়ালের একটি বিশাল
দারুচিত্রে
নগরনটী কমলা অভয়মুদ্রায় নৃত্যপরা। দেয়ালের অন্য পাশে
হরিণের চারটি মাথা।
মৃত হরিণেরা তাদের চারজোড়া পোখরাজের হলুদ চোখে
আমাকে দেখছে।

ভাবলাম, এ প্রাসাদ কার ? আর অমনি ভেতর থেকে একজোড়া কপাট
আস্তে খুলে গেলো।
আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রাসাদের রাজা আর রাণী।
রাজার হাতে যে চাবুকটা আছে
তা আমার কানের কাছে শব্দ করে উঠতেই, আমি
ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। কিন্তু রাণীমা মহারাজের হাত চেপে ধরে
বললেন,
মেরো না, কে ও ?
আমি বললাম, মা, আমি হত্যার অভিযোগে বন্দীদের একজন,
আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই। আর কোনোদিন আসবো না।
বিকট হাসিতে রাজপ্রাসাদ কেঁপে উঠলো। মহাসামন্তমহারাজাধিরাজ
হাসতে লাগলেন ! মেহগনির তাকের ওপর কালো বুদ্ধমূর্তিটি
আরও কালো হয়ে গেলো মহারাজের হাসিতে। আমি আবার ভয়ে
কাঁপতে লাগলাম। আর তখুনি মহারাণী আমাকে বাঁচালেন।
বললেন, আমার পেছনে এসো।

এক চক্রবর্তী রাজার হাসি আর পৈশাচিক চাবুকের হাত থেকে
বাঁচার জন্যে
বালক ভৃত্যের মত রাজ্ঞীর ভূমিতে লুটানো আঁচল তুলে ধরে
আমি কম্পিতপদে তার অনুসরণ করলাম।

বহু ঘর পার হয়ে এক উজ্জ্বল কামরায় আমাকে থামতে বলা হলে,
আমি চোখ তুলে দেখলাম, চারটি স্বর্ণময় সিংহ-আসনে
চারজন রাজকন্যা কথোপকথনে রত।
চারজনের চার বাহারের শাড়ি আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল।
কেউ পরেছে জামদানী, কেউ কনকের কাজকরা মসলিন।
কারো হাল্কা আব্রুয়ানের স্বচ্ছতা পার হয়ে দেহলতা দেখা যাচ্ছে।
আবার কারো গাঢ় লাল নয়নসুক শাড়ির পাড়ে
শাদা আগুনের মত রুপোর চুমকি জ্বলছে।
কুমারীরা তাদের বুকের ওপর দিয়ে দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে দিয়েছে।
যেন চার রকম অগ্নিশিখার ওপর
ঝাঁপিয়ে পড়েছে চারটি কালো সাপ।
আমি হতবাক হয়ে রাণীমার দিকে তাকালাম।
তিনি অভিভাবিকার মত আমার দিকে ফিরে বললেন,
এখান থেকে তোমার সঙ্গিনী বেছে নাও।
আমার মনে হলো, তার নির্দেশ মেনে নেয়া উচিত। কিন্তু আমি
কাকে পছন্দ করবো ?
চারজনই আমার কাছে সমান রুপসী বলে বোধ হলো।
এদের মধ্যে কে অন্যতমা ?
আমার চোখ, আমাকে কোনো সাহায্যই করতে পারছে না।

রাণীমা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন,
তোমার চোখ, কোনো কাজের নয়। আমি তাড়াতাড়ি বললাম,
মা, আমার অন্য ইন্দ্রিয়ও আছে। দেখুন আমার হাত,
আমি স্পর্শ করতে পারি। এই যে আমার নাক,
আমি আঘ্রাণ নিতে পারি। আর
এ জিহ্বা দিয়ে আমি লেহন করি।
চারটি প্রাণলাবণ্যের স্বাদ নিয়ে আমাকে পছন্দ করতে দিন।
রাণী হেসে আমাকে মেয়েদের কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন।
আমি প্রথম কুমারীর চিবুক স্পর্শ করতেই পুলকে শিহরিত হলাম

তার ওষ্ঠের পাশে ঘাসফুলের মত একটি রক্তবর্ণ তিল দেখে
আমার ভালো লাগলো।
দ্বিতীয় কুমারীর মাথায় হাতরেখে তার মুখের দিকে তাকালাম,
সুন্দর নাসিকার ওপর মুক্তোর নাকফুল তিলপুষ্পের চেয়েও
অপরূপ মনে হলো। আমি অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।
আমি যখন তৃতীয়ার কাঁধ স্পর্শ করে দাঁড়ালাম, মেয়েটি হাসলো।
তার পানিফলের মত অপরূপ দাঁত আমার ঠোঁটে চুম্বনের ইচ্ছাশক্তির
প্ররোচনা দিল। কিন্তু আমাকে তো চতুর্থজনকেও দেখতে হবে ?
আমি শেষ অর্থাৎ প্রান্ততমার হাত ধরে দাঁড়ালে, এই কিশোরী
লজ্জায় নতমুখী হয়ে রইলো। অন্যহাতে তার চিবুক তুলে ধরতেই
সে চোখ বুজলো।
এই মৃগনয়নার দু'টি গাঙচিল আমার বাসনার সমুদ্রে
উড়াল দিয়ে থাকলো। আমি কাকে নেবো ? আমার স্পর্শইন্দ্রিয়ও
আমার সাথে নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমি
আমার ঘ্রাণশক্তির কথা ভাবলাম।

এই আমার শেষ পরীক্ষা। আমার আরও ইন্দ্রিয় আছে
কিন্তু আমি কতক্ষণ আর এক মহান রাজ্ঞীকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি ?
প্রতিটি নারীকে আঘ্রাণ করার নিমিত্ত আমি প্রথমার কাছে ফিরে এলাম।
আমি তার বুকের কাছে মুখ নামাতেই
সে তার প্রথম বোতাম খুলে দিল। বহুদূরাগত নেবুফুলের গন্ধে
আমার মস্তিষ্ক ভরে যাচ্ছে। হায়, ফুলের গন্ধে
আমার কি কাজ ?
আমি দ্বিতীয়ার কাছে পৌঁছবার আগেই, সে তার পোশাকের
দু'টি বোতাম খুললো। মৃগনাভির ঝাঁঝালো গন্ধে
আমার শরীর যদিও রোমাঞ্চিত হচ্ছে, তবুও
আমি কস্তুরী-সুবাসের জন্যে উপত্যকা পার হয়ে আসিনি !
আমি তৃতীয়ার বুকে তিনটি বোতামই খোলা দেখলাম।
দু'টি বর্তুল শঙ্খের মাঝে নাক ডুবিয়ে আমি প্রাণপণ শুঁকতে লাগলাম।
ধূপের গন্ধে চিরকাল আমার দম বন্ধ হয়ে আসে,
যেন আমি কোনো পূজামণ্ডপের অসংখ্য ধূপদানীর ধোঁয়ার আঁধারে
দেবীর মুখে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

তারপর উন্মত্তের মত আমি চতুর্থ, অর্থাৎ প্রান্তবর্তিনীর কাছে এসে নতজানু হয়ে বসে পড়লাম। বললাম, বাঁচাও আমাকে, দয়া করো। নতমুখী রাজকন্যা দু'হাতে তার বুক চেপে ধরলো। আমি দ্রুত তার কম্পিত হাত সরিয়ে দিলে, সে লজ্জায় গ্রীবা বাঁকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরালো। এই প্রথম আমি কোনা নারীর মধ্যে লজ্জা দেখলাম। আর তা আগুনের মত লাল, আর শোণিতের মত সঞ্চরণশীল। তার দু'টি মাংসের গোলাপ থেকে নুনের হাল্কা গন্ধ আমার কামনার ওপর দিয়ে বাতাসের মত বইতে লাগলো। যেন আমি লবণ পর্বতের পাদদেশে ঘুমিয়ে পড়বো।

সহসা সম্রাজ্ঞীর দিকে ফিরে বললাম, মা এই আমার মনোনীতা। আমার বাক্যস্ফুরিত হওয়ামাত্র ভোজবাজির মত রাণী তার অপরা কন্যাদের নিয়ে দুঃখিতের মত চারটি দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। আর আমি আমার মনোনীতার হাত ধরে বললাম, আমরা কোথায় যাবো ? বধূ বললো, বাসরে।

মেহগনির বিশাল পালঙ্কে আমার বিছানা। আমি নদীর মত বাঁকে বাঁকে ঘোরানো তার শাড়ির আঁচল যখন মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছি, ঠিক তখুনি সেই সর্বনাশা হাসি শুনতে পেলাম। ঠা ঠা শব্দে রাজার সেই পাথর কাঁপানো হাসিতে আমার স্ত্রী দৌড়ে পালিয়ে গেলো। আর অদৃশ্য চাবুক ছোবল মারল আমার মস্তকে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। আর

অজ্ঞান মানেই হলো, অভুক্ত স্বপ্ন থেকে ফিরে আসা।

প্রাচীর থেকে কথা

কে যেন প্রাচীর থেকে কথা বলে, যোশেফ, যোশেফ !
রাজার স্বপ্নের মানে বলেছিলে তুমি সেই লোক ?
না আমি যোশেফ নই, না। জানি না ফ্যারাও কে, স্রেফ
নিজেরই স্বপ্নের দাগে লাল করে রেখেছি দুচোখ।

কংক্রীট, লোহার জালি, সান্ত্রিদের সঘন পাহারা
পেরিয়ে আমার দিবা-স্বপ্নের ছবি যারা আঁকে
কেউবা চালায় হাল, কেউ রোয় উবু হয়ে চারা
কেউ, যে বক্তৃতা করে, চরের মানুষ কাছে ডাকে।

আর বুক খোলামেলা শিশুর মুখের কাছে কাত,
হারের সোনার চিক, তিল ঘাম, বহুতা শিরার দাগে নীল,
এ নিয়ে দেয়াল কাটে তীক্ষ্ণ দাঁত স্বপ্নের করাত—
কিংবা গারদ ভেঙে ডেকে আনা হাতের মিছিল।

যদিও বোঝে না কবি রাজাদের স্বপ্নের কি মানে,
কিন্তু এটা তো জানে, হত্যাই হত্যা ডেকে আনে।

আমার মাথা

আজকাল এমন হয় যে, আমার মাথা আমি আর
নামাতেই পারি না।
পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন দেয়ালের মত শক্ত
আর উঁচু মনে হয় আমার মাথাকে।
ভৈরবের ব্রীজ ছাড়িয়ে, মেঘনার ঢেউয়ে পাল দুলিয়ে
দক্ষিণগামী ধানের নৌকার মাঝিরা যেমন
বীরগাঁওয়ের বিশাল দেবদারু গাছটা খোঁজে,
আমার মাথাও তেমনি দিকনির্ণায়ক বৃক্ষের মত উঁচু হয়ে উঠেছে।

দেখো, অসংখ্য দুঃখী মানুষের হাত
আমার নগ্ন মস্তকের দিকে তর্জনী তুলেছে।
একদা আমি যাদের কাছে নত হওয়া শিখেছিলাম,
রপ্ত করেছিলাম অভিবাদনের কায়দা-কানুন,
তারাই আজ আমার ঝুঁটি দেখে চিন্তিত।
তাদের দাঁত ঘষটানির শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি,
তাদের বন্দুকের নল এখন আমার মাথার দিকেই তাক করা।

এই যে আমার চুল বাতাসের ঝাপটে এখন
নিশানের মত উড়ছে,
জাপানের উষ্ণ স্রোতের নাভি থেকে উঠে এসেছে এ হাওয়া,
এ বাতাস মৌলমিনের কাঠের বাগান পেরিয়ে
উ-পোক্নির কবিতার মত আমার মস্তকে বিলি কাটছে।

আমার মাথার জন্য অশ্রুসজল আবেদনে কাঁপছে
ভ্রমরকৃষ্ণ একজোড়া চোখের পাতা ঃ
তার সন্তানদের কেউ যেন 'বেইমানের বাচ্চা' না বলে।

দূর মফস্বল শহরের এক দুর্বল বৃদ্ধা
তার সান্ধ্য প্রার্থনার জায়নামাজ বিছিয়েছে ঃ
প্রভু, আমার ছেলের ঘাড় পাথরের মত শক্ত করে দাও।

সাবধান, আমার মাকে কেউ যেন গোলামের গর্ভধারিণী না বলে।

ধাতুর ওলান থেকে

মানুষ আবার দেখো সোনার গাভীর কাছে যায় ;
পেছনে পর্বতশীর্ষে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত সুন্দর আওয়াজে
পবিত্র অক্ষরগুলো ঝরে যায়, আয় ফিরে আয় !
আর সে আহ্বান শোনো, বিবেক ফাটিয়ে দিয়ে বাজে।

কান্তার, কান্নার রোল, যাক্কুম গাছের সেই ভীড়ে
ক্ষুধার্ত, তোদের জন্য ছিলনা কি স্বর্গীয় শস্যের শাদা দানা ?
তবুও পাজর ভেঙে সংগোপন রক্তের তিমিরে
সোনার গাভীর ঘাড় নেমে আসে ? দিয়ে যায় হানা

সুতীক্ষ্ন কাঞ্চন শৃঙ্গ, কিম্বা তারি আলোকিত ক্ষুর ?
ধাতুর ওলান থেকে কখনো কি ঝরে দুধ, নামে ক্ষীরধারা ?
সোনার স্তনের গন্ধে তবু ওরে ধূসর বাছুর—

লেহনে মর্দনে ক্লান্ত চাটো বাট মত্ত-মাতোয়ারা ;
তবু কি আহ্বান থামে ? আয় আয় ডাকছে সিনাই
ওপরে পর্বত ডাকে, অন্যদিকে সমিরির গাই।

দেয়াল

মুর্তাজা বশীরকে

একটি দেয়াল শুধু ছিন্ন করে দিয়েছে জগত।
যা ছাড়িয়ে গেছে চোখ, মাথা আর আত্মার সীমানা।
দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠা কয়েদীরা বার বার ফিরে ফিরে দেখে
পাখির বিষ্ঠায় ভরা শেঁওলার সবুজে সটান
আছে রাজাধিরাজের মত, পাষাণ প্রবল
উদ্যত সে।

আমরা তাকিয়ে থাকি, কাছে গিয়ে হাত রাখি
পাথরের ঘ্রাণ ও পছিনা
নাকের ভিতর দিয়ে পেঁাছে যায়, শোণিতে শিরায়।

নখের আঁচড়ে কারা লিখে রেখে গেছে কারো প্রিয়তম নাম।
নাম, যেন পাষাণ ফাটিয়ে দেয়া কয়েকটি ছোবল।
সব কান্না ফিরে আসে, ফিরে আসে
শাপ-অভিশাপ ;
ঘৃণায় ছিটিয়ে দেয়া থুথুতে পিচ্ছিল
দেয়াল তেমনি থাকে আমাদের মাথার ওপরে।

তবু কোনো সূর্যোদয়ে দেয়ালের ওপাশে যেনবা
জীবনের স্রোত শোনা যায় ;
মনে হয় দেয়ালের ওপিঠেও কারা
ভয়ংকর তুলির আঁচড়ে
পাথরবিরোধী কোনো কথার মহিমা
সাজিয়েছে অক্ষয় কালিতে। আর
পরস্পর ঐক্যের অক্ষরে
দেয়ালের এপাশে ওপাশে
ভূকম্পনে নড়ে ওঠে আমার শরীর।

সক্রেটিসের মোরগ

একটি মোরগ শুধু ঋণী আমি আপোলোর কাছে ;
দেখো যদি পারো তবে দিও সেই দেনা শোধ করে,
হেমলক নামছে নীচে, অন্ত্রস্থলে ধমনীর গাছে ;
একটু হাঁটতে চাই, পাথরের বিছানো চাদরে।
কাল সারারাত জানো, ঈশপের গল্পের প্রাণীরা
আমার চৈতন্যে, বোধে, এনেছিল কাব্যের রসদ ;
কত ধানে কত চাল, জানে যাঁরা এদেশের কালজ্ঞ মানীরা
জানেনা আঙুর কবে, কি বিপাকে, হয়ে যায় মদ !

তুমি তো জানোই ক্রীটো, মেষের পায়ের কাছ থেকে
কখন, কিভাবে যায় ঘোলাজল নেকড়ের উজান ?
অন্তত আমার কথা বলে দিও যুবাদের ডেকে
হয়তো তারাই পারে ঠেকাতে এ জলের বিধান ;
একটা মোরগ শুধু রেখে দিও দেবতার কাছে
যেখানে জলপাই পাতা পাথরের লজ্জা ঢেকে আছে।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

কারাগারে বুদ্ধদেব বসুর আকস্মিক তিরোধানের খবর পড়ে

বীয়ারের টলটলে গ্লাস হাতে নিয়ে আমি অপেক্ষার উত্তেজনায়
থরথর কাঁপছিলাম ঃ বুদ্ধদেব বসুকে একটু পরেই দেখতে পাবো।
শিরায়, সন্ধিতে এক অদ্ভুত শিহরণ খেলছিল।
তাহলে শাপভ্রষ্ট দেবদূতের সাথে সত্যি আমার দেখা হবে ?
বিশ্বাস হতে চাইছিল না।
দেখা হবে ?   যার আশীর্বাদে একদা বেশ্যা, বেকার আর
বাউন্ডুলেদের আস্তানায় এক পদ্যমাতাল কিশোরের পিঠে
একজোড়া পাখা গজিয়ে গিয়েছিল ?

আমাকে ফুসলিয়ে এনেছে এক তরুণ কবি, যার আছে
অপ্সরীর মতো সুন্দরী সঙ্গিনী।
মীনাক্ষি, যে কিনা শাপভ্রষ্ট দেবদূতের কন্যা।
জ্যোতির্ময়, সেই তরুণ কবি—মাটি সরে যাবার ভয়ে
যে সব সময় পায়ের পাতা খালি রাখে।   হাসলে মনে হয়,
নিরর্থক হাসি ছাড়া ১৯৭১ সালে বাঙালী কবিদের
আর কি করার ছিল !

১৯৭১ সাল।
আমি পালিয়ে এসেছি আমার দেশ থেকে।
আমার স্ত্রী কোথায়, আমি জানিনা। আমার বন্ধুরা
আছে কি নেই বেতারে সেই উদ্বেগ উচ্চারিত হচ্ছে।
বুদ্ধদেব, আপনার মুখ দর্শনের জন্য আমি এক বিদেশী
কূটনীতিকের
ভোজসভায়, অনাহূত বেহায়ার মত ঢুকে গিয়েছিলাম !

যদিও মেজবান দম্পতি আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন,
বললেন, কবির জন্য এ দ্বার সর্বদা অবারিত।   তবুও
আমি অভ্যাগতদের চোখের দিকে তাকাতে পারছিনা।
প্রত্যেকের চোখে চোখে দাবার ঘুটি চালাচালি হচ্ছে।

আমার হাতে বীয়ারের গ্লাস কাঁপছে। এক মার্কিন
নাট্যামোদী ভদ্রলোক কানের কাছে মুখ এনে বললেন,
তোমাদের ছেলেরা ভালোই লড়ছে, জিত হবে। ভেবোনা।

আমি বীয়ারের ফেনায় ফু দিতে দিতে হাসলাম।
হাসলাম এমনভাবে যে, আমার হাসি
ভিয়েৎনামের উত্তরাংশের মানচিত্রের মত প্রসারিত হতে থাকলো।
যেখানে বোমার গর্ত আর অসংখ্য শহীদের কবরগাহের পাশে
সবুজ ধানের শীষ দুলছে।
আমার শরীর ঘেষে এক বিদেশিনী অনবরত বলতে লাগলেন,
বেংলাদেশ......
বেংলাদেশ......
বেংলাদেশ......
তার চোখে বিবমিষা। যেন মেঘনা পাড়ের রসিক জেলে যুবতীরা
ঠাট্টা করে তাকে সিদলের ঝাল ভর্তা খাইয়ে দিয়েছে। আর
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঝালমরিচ উগড়ে ফেলার জন্য
এখনই তার বঙ্গোপসাগরের মত ঘোলাটে আর
সুবিধাজনক একটা বড়ো পিকদানী দরকার !

অভ্যাগতদের শেষজোড়া ঘরে পা দেবা মাত্রই
আমাকে জানানো হলো, এই যে বুদ্ধদেব এলেন !
প্রধান অতিথির সামনে আমি নামধামসহ আমার
ডানহাত বাড়িয়ে দিলাম।
কিন্তু একি, আপনার হাত, বুদ্ধদেব, বরফের মতো ঠাণ্ডা।
আপনার মুখ ফসিলের মত কুঁচকানো ! আর
আপনার চোখ ? না, আপনার চোখ
ইন্দ্রের অস্ত্রের মত উজ্জ্বল ! যজ্ঞের ঘৃতদীপ্ত হুতাশন !

তাহলে, এই হলো আর্যদের আদি অগ্নিশিখা ?
যা রক্ত, মেদ, প্রাণ ও অপ্রাণ, কাম ও কর্মফলের মধ্যে
পক্ষপাতহীন লেলিহান জিহ্বা তুলে ধরে ?
আপনি আমার সাথে আলাপ জুড়ে দিলেন।

আপনার পাশে প্রতিভা বসু, তার রচনার মত সহৃদয়
আভা ছড়িয়ে হাসছেন।
আমার কাছে জানলেন ঢাকার অবস্থা।
হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও আক্রান্তদের মধ্য থেকে আমি এসেছি
আমি বললাম।
আপনার মুখ হিটাইটদের প্রাচীন মন্দিরের
পুরোহিতের মত নিষ্কম্প রইল।
রেখা ভাঙলো না, ঢেউ উঠলো না।
যেন পরাজিত হও, লুটিয়ে পড়ো, সেবা কর—ছাড়া
নৈরাজ্যের গহ্বর থেকে আর কিছুই বেরুবে না।

কেন জানি, আমার পিঠটা অসম্ভব ব্যথা করে উঠলো।
ভয়ে কুঁচকে গেলাম আমি। সারা ঘরে আনন্দ ও হাসির
হর্‌রা চলছে। আমি এখানে নিমন্ত্রিত নই। বাংলাদেশের
গ্রামগুলো জ্বলছে। আমার স্ত্রী কোথায়, আমি জানিনা।
জানিনা বন্ধুরা মৃত না জীবিত।
যে কিশোর তিনটি কথার ফুয়ে পেয়েছিল স্বপ্নের পালক
এখন তার পিঠে অসম্ভব ব্যথার কাঁপুনি।

যে যাদুকর আমাকে একদা উড়াল শিখিয়েছিলেন
যেন মন্ত্র বলে আবার তা তুলে নিলেন। কিম্বা যেন
আমারি ডানা আমার বাহুর মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে
পিঠে রয়ে গেলো দগদগে ব্যথা।
অনাহূত, তাড়িতের মত কারো পাত্রের নুন স্পর্শ না করে
আমি যখন কলকাতার
একটি অন্ধকার গলি পার হচ্ছি,
সাম্রাজ্যবাদীদের ভোজসভার বাতি তখন জ্বলে উঠেছে।
আর বুদ্ধদেব, ধনতন্ত্রের শেষ ভোজসভায়
আপনি আমন্ত্রিত।

কৃষ্ণের জীব

কড়িকাঠ গুণে গুণে যখন এ-চোখ দুটি ক্লান্ত হয়ে আসে
ঝট্‌তি ওড়ার শব্দে সচকিত করে দেয় একজোড়া পাখি,
চড়ুই, বসেছে দেখি শশব্যস্ত, দেয়ালের বিশাল ফোঁকরে।

পুরুষ যে, শোনো তার গলা, ভালোবেসে ফাটায় পাথর
আর ঠোঁট ঘষে সঙ্গিনীর ডানার ভেতর। যেন
মিথ্যে তোষামোদে কালো হয়ে গেছে মুখ
কালো হলো বুকের পশম।
দেখো, এইতো পুরুষ !

আর দেখো সঙ্গিনীকে
পাখার ঝাপটে সে ঠেকায় চুম্বন।
স্তোকবাক্য ঠেলে দিয়ে বলে
একটু থামোতো বাপু, এসো
কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসি।
দেয়ালে কোথাও যদি থেকে থাকে বাসার সুযোগ
চলো তবে আনি খড়কুটো।
এই হলো নারী !

জেলগেটে দেখা

সেলের তালা খোলা মাত্রই এক টুকরো রোদ এসে পড়লো ঘরের মধ্যে।

আজ তুমি আসবে।
সারা ঘরে আনন্দের শিহরণ খেলছে। যদিও উত্তরের বাতাস
হাঁড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়ে বইছে, তবু আমি ঠান্ডা পানিতে
হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। পাহারাদার সেন্ট্রিকে ডেকে বললাম,
আজ তুমি আসবে। সেন্ট্রি হাসতে হাসতে আমার সিগ্রেটে
আগুন ধরিয়ে দিল। বলল, বারান্দায় হেঁটে ভুক বাড়িয়ে নিন
দেখবেন, বাড়ী থেকে মজাদার খাবার আসবে।

দেখো, সবাই প্রথমে খাবারের কথা ভাবে।
আমি জানি বাইরে এখন আকাল চলছে। ক্ষুধার্ত মানুষ
হন্যে হয়ে শহরের দিকে ছুটে আসছে। সংবাদপত্রগুলোও
না বলে পারছে না যে এ অকল্পনীয়।
রাস্তায় রাস্তায় অনাহারী শিশুদের মৃতদেহের ছবি দেখে
আমি কতদিন আমার কারাকক্ষের লোহার জালি
চেপে ধরেছি।
হায় স্বাধীনতা, অভুক্তদের রাজত্ব কায়েম করতেই কি আমরা
সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলাম ?

আর আমাকে ওরা রেখেছে বন্দুক আর বিচারালয়ের মাঝামাঝি
যেখানে মানুষের আত্মা শুকিয়ে যায়। যাতে
আমি আমার উৎস খুঁজে না পাই।
কিন্তু তুমি তো জানো কবিদের উৎস কি ? আমি পাষাণ কারার
চৌহদ্দিতে আমার ফোয়ারাকে ফিরিয়ে আনি।
শত দুর্দৈবের মধ্যেও আমরা যেমন আমাদের উৎসকে
জাগিয়ে রাখতাম, তেমনি।

চড়ুই পাখির চিৎকারে বন্দীদের ঘুম ভাঙছে।
আমি বারান্দা ছেড়ে বাগানে নামলাম।
এক চিলতে বাগান
ভেজা পাতার পানিতে আমার চটি আর পাজামা ভিজিয়ে
চন্দ্রমল্লিকার ঝোপ থেকে একগোছা শাদা আর হলুদ ফুল তুললাম।
বাতাসে মাথা নাড়িয়ে লাল ডালিয়া গাছ আমাকে ডাকলো।
তারপর গেলাম গোলাপের কাছে।
জেলখানার গোলাপ, তবু কি সুন্দর গন্ধ !
আমার সহবন্দীরা কেউ ফুল ছিঁড়ে না, ছিঁড়তেও দেয় না
কিন্তু আমি তোমার জন্যে তোড়া বাঁধলাম।

আজ আর সময় কাটতে চায়না। দাড়ি কাটলাম। বই নিয়ে
নাড়াচাড়া করলাম। ওদিকে দেয়ালের ওপাশে শহর জেগে উঠছে।
গাড়ীর ভেঁপু রিক্সার ঘণ্টাধ্বনি কানে আসছে।
চকের হোটেলগুলোতে নিশ্চয়ই এখন মাংসের কড়াই ফুটছে।
আর মজাদার ঝোল ঢেলে দেওয়া হচ্ছে
গরীব খদ্দেরদের পাতে পাতে।

না, বাইরে এখন আকাল। মানুষ কি খেতে পায় ?
দিনমজুরদের পাত কি এখন আর নেহারির ঝোলে ভরে ওঠে ?
অথচ একটা অতিকায় দেয়াল কত ব্যবধানই না আনতে পারে।
আ, পাখিরা কত স্বাধীন ! কেমন অবলীলায় দেয়াল পেরিয়ে যাচ্ছে
জীবনে এই প্রথম আমি চড়ুই পাখির সৌভাগ্যে কাতর হলাম।

আমাদের শহর নিশ্চয়ই এখন ভিখিরিতে ভরে গেছে।
সারাদিন ভিক্ষুকের স্রোত সামাল দিতে হয়।
আমি কতবার তোমাকে বলেছি, দেখো
মুষ্টি ভিক্ষায় দারিদ্র্য দূর হয় না।
এর অন্য ব্যবস্থা দরকার, দরকার সামাজিক ন্যায়ের।
দুঃখের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে।
আ, যদি আমার কথা বুঝতে !

প্রিয়তমা আমার,
তোমার পবিত্র নাম নিয়ে আজ সূর্য উদিত হয়েছে। আর
উষ্ণ অধীর রশ্মির ফলা গারদের শিকের ওপর পিছলে যাচ্ছে।
দেয়ালের ওপাশ থেকে ঘুমভাঙা মানুষের কোলাহল !
যারা অধিক রাতে ঘুমোয় আর জাগে সকলের আগে।
যারা ঠেলে।
চালায়।
হানে।
ঘোরায়।
ওড়ায়।
পোড়ায়।
আর হাত মুঠো করে এগিয়ে যায়।
সভ্যতার তলদেশে যাদের ঘামের অমোঘ নদী
কোনদিন শুকোয় না। শোনো, তাদের কলরব।

বন্দীরা জেগে উঠছে। পাশের সেলে কাশির শব্দ
আমি ঘরে ঘরে তোমার নাম ঘোষণা করলাম
বললাম, আজ বারোটায় আমার 'দেখা'।
খুশীতে সকলেই বিছানায় উঠে বসলো।
সকলেরই আশা তুমি কোন না কোন সংবাদ নিয়ে আসবে।
যেন তুমি সংবাদপত্র ! যেন তুমি
আজ সকালের কাগজের প্রধান শিরোনামশিরা !

সূর্য যখন অদৃশ্য রশ্মিমালায় আমাকে দোলাতে দোলাতে
মাঝ আকাশে টেনে আনলো
ঠিক তখুনি তুমি এলে।
জেলগেটে পেঁাছে দেখলাম, তুমি টিফিন কেরিয়ার সামনে নিয়ে
চুপচাপ বসে আছো।
হাসলে, ম্লান, সচ্ছল।
কোনো কুশল প্রশ্ন হলো না।

সাক্ষাৎকারের চেয়ারে বসা মাত্রই তুমি খাবার দিতে শুরু করলে।
মাছের কিমার একটা বল গড়িয়ে দিয়ে জানালে,
আবার ধরপাকড় শুরু হয়েছে।
আমি মাথা নাড়লাম।

মাগুর মাছের ঝোল ছড়িয়ে দিতে দিতে কানের কাছে মুখ আনলে,
অমুক বিপ্লবী আর নেই
আমি মাথা নামালাম। বললে, ভেবোনা,
আমরা সইতে পারবো। আল্লাহ, আমাদের শক্তি দিন।
তারপর আমরা পরস্পরকে দেখতে লাগলাম।

যতক্ষণ না পাহারাদারদের বুটের শব্দ এসে আমাদের
মাঝখানে থামলো।

কবি ও কালো বিড়ালিনী—১

দেয়াল ডিঙিয়ে আসে কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের আরোহী
চাবুকের শিস তুলে সাহসী সে অদৃশ্য সোয়ার
নামেন এ কারাকক্ষে ; আমার হৃদয়ে কোন ওহী
হবে কি নাজেল তবে ? ফেটে পড়বে রুদ্ধ কারাগার ?

চড়ুইয়ের চীৎকার নেই ; দেয়ালের গর্তগুলো আছে
অতিকায় কংকালের বিশাল চোখের মত খল।
ইট আর ধাতুর বন্ধনী আমি বুঝে ফেলি পাছে,
সে জন্য সতর্ক সবি ; জানালার দোলানো কম্বল,

সান্ত্রির সজাগ চোখ, তাক করা বন্দুকের মাছি
পার হয়ে চলে আসে কালো এক বিড়ালিনী রোজ ;
দু'চোখ ঘুরিয়ে দেখে, আমি তারি প্রতীক্ষায় আছি

যেমন প্রত্যহ থাকি, সামনে সাজিয়ে রেখে ভোজ।
তবে কি তুমিই সেই ? শোপেনহাওয়ার যার খোঁজে
যেতেন প্রকৃতি, প্রেম, দর্শনের গম্বুজে বুরুজে ?

কবি ও কালো বিড়ালিনী—২

মৃদু পতনের মত এক লাফে যখনই সে ঢোকে
জিহ্বার সরল শব্দে ডাকি তাকে আমার শয্যায়
একটু দাঁড়ায়, দেখে, যেন এক যুবতী লজ্জায়
আঙুল, নখের প্রান্তে মেহদীর গন্ধটুকু শোঁকে।

না, আমার জামিন হয়নি, বলি তাকে। দু'কদম
হাঁটার ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ায় সে আমার বালিশে ;
শিস দিয়ে ভুলে আনি ; তার কালো রোমের পালিশে
হাত ঘসে বলি কানে, সে-ও ছিলো এমনি নরম।

হতভাগিনী সে, দুঃখী। তবু তার যত বিনিময়
আমার তাপিত ঠোঁট ভরেছিলো সুস্বাদু লবণে
তারি স্মৃতি দোলা দেয় মৃত এক দারুচিনি বনে

আর ঝরে মরে যায় সময়ের ভিতরে সময়।
কবি ও বিড়ালী কালো সঙ্গোপনে আছি দুইজনে
কার সাধ্য রুদ্ধ করে আমাদের এই পরিচয় ?

কবি ও কালো বিড়ালিনী—৩

ফলন্ত কবির হাত বুলাতে বুলাতে তোর পিঠে
বোদ্‌লেয়ার রেখেছেন যে কয়টি অদ্ভুত চরণ
ফের বেঁচে ওঠে তা-ই, বন্দীর হৃদয়ে রন্ধ্রে, ইটে ;
যদিও পশম তোর শুভ্র নয়, রাত্রির বরণ।

যেন শত বৎসরের অতিদূরে ব্যবধান ঠেলে
এসেছে নাগরী এক গাত্রবর্ণ পাল্টে নিয়ে তার ;
ঘাঘরা, জুতোর ফিতে, আর গূঢ় দড়ি খুলে ফেলে
কালোপেড়ে নীলাম্বরী মেলে দেয় দারুণ বাহার।

চামড়া যেমনই হোক, শুভ্র গল, কিম্বা বাঙালিনী—
শ্যামা, হোক কালো, পীত, রোদেজ্বলা অথবা পিঙ্গলা
চোখের পলকে যেন মনে হয়, চিরদিন চিনি ;

আর দেখো, বিদ্ধ করে একই তীব্র নিয়তির ফলা।
কে বোঝে, কবিরা কবে কার কাছে কী রকম ঋণী ?
শুধু জানি সহোদর, পরস্পর ধরে আছি গলা।

মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো

পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থটি বুকের ওপর রেখে
আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হয় এ ছিল সত্যিকার ঘুম
কিংবা দুপুরে খাওয়ার পর ভাতের দুলুনি। আর ঠিক তখুনি
সেই মায়াবী পর্দা দুলে উঠলো, যার ফাঁক দিয়ে
যে দৃশ্যই চোখে পড়ে, তোমরা বলো, স্বপ্ন।

আমার মনে হলো, কানে তালা লাগানো প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে
কারাগার ভেঙে পড়েছে। আমি চিৎকার করে
বিছানায় লাফিয়ে উঠলাম। আমার বুকের ওপর থেকে
উজ্জ্বল গ্রন্থটি গড়িয়ে পড়লো বালিশে।
চারদিকে বিশাল বিম, ইট আর সুরকিতে আমার কামরা
আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। যেন দৈবক্রমে আমি রক্ষা পেয়েছি।
এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমার খাটটাকে মনে হলো
নূহের নৌকা।

আমার সহবন্দীরা কোথায় ?
ধ্বংসস্তূপের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি তাদের খুঁজলাম ! না,
চারিদিকে ইট আর লোহা ছাড়া কিছুই দেখছি না।
মুহূর্তের মধ্যে ইংরেজ আমলের এই ভয়াবহ দালান
একটি নিঃস্তব্ধ কবরখানার মত ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার গলাছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু
অর্থহীন রোদনে আমি কোনোদিন বিশ্বাস করি না। আর
যে বিশাল দেয়ালের ভিতর আমাকে আটকে রাখা হয়েছিল,
এখন সেখানে দেয়ালও আর নেই।

যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সব মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।
হঠাৎ আমার মনে হলো, এত বড়ো প্রলয় হয়ে গেলো, কই
কোনো মানুষকে দেখেছি না কেনো ? নারীর বিলাপ বা
শিশুর আর্ত চিৎকার শোনার জন্যে আমি কান পাতলাম।
কোনো শব্দ নেই। না কান্নার না আর্তস্বরের।
আর এই ধ্বংসস্তূপের চূড়া থেকে সারা শহরই আমার চোখে পড়লো।
বিনাশপ্রাপ্ত এক মহানগরীর মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।
তবে কি পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে ? কিংবা
হাইড্রোজেন বোমায় প্রাণের স্পন্দন লুপ্ত হয়ে গেছে ?
তবে আমি কি করে আছি ?

ভাবতেই আমার গা কাঁটা দিতে লাগলো। ভয় হলো,
এখনই কোনো তেজষ্ক্রিয়তা আমাকে স্পর্শ করবে। কিংবা
ইস্পাতভেদী কোনো গামারশ্মির ছটায় আমার শরীর,
আমার রক্তমাংস খসে পড়বে। জাপানের বিধ্বস্ত দু'টি নগরীর কথা
আমার মনে পড়তেই, অ্যালে রেনের সেই ছবি আমার চোখে
ভাসতে লাগলো—হিরোশিমা মন আমুর। হায়
এ শহরে যে বিষদগীতি গাইবারও কেউ রইল না।

ভাবলাম, আমার প্রিয় নগরী, আমার দেশ, আর আমার
প্রিয়জন যদি লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বেঁচে থেকেই বা
কি হবে ? আমি বাঁচবো কাদের নিয়ে ? আমার স্ত্রী,
আমার সন্তানদের কথা আমার মনে পড়লো। আমার
দু'চোখ বেয়ে নামলো নদী। আমি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলাম।

যদি তারা বেঁচে নাও থাকে আমি ভাবলাম, সেই গৃহের কাছে
একবার যাবো। কতদিন আমি জেলে, কতদিন আমি
তাদের দেখিনি। যদিও ধ্বংসস্তূপ সমস্ত পায়ে চলার পথ
ঢেকে দিয়েছে, তবু পা বাড়াতে মনস্থ করলাম।

ইটের নীচে চাপাপড়া আমার কক্ষের দিকে চোখ পড়তেই
দেখলাম, স্যুটকেস, পোশাক-আশাক বইপত্র
সবকিছু ঢাকা পড়ে আছে। কোনো কিছুই উদ্ধারের আশা নেই।
আমি শুধু বিছানার ওপর পৃথিবীর সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থটি দেখলাম,—
কোরান, খোলা, বাসাসে পবিত্র পৃষ্ঠগুলো নড়ছে।

আমি জনমানবহীন বিরাণ নগরীর পরিত্যক্ত পাথরে
আল্লার আদেশ পরিত্যাগ করতে পারি না। আমি
ধ্বংসস্তূপের ওপর থেকে সেই মহাগ্রন্থের কাছে নেমে এলাম।
যখন দু'হাত বাড়িয়ে তা বুকের কাছে তুলে আনতে যাবো,
খোলা পৃষ্ঠায় একটি আয়াতের ওপর নজর পড়লো ঃ

"এই ভাবে বহু শহর আমি ধ্বংস করেছি যেহেতু তা ছিল অন্যায়কারী,
ফলে তা ধ্বংস স্তূপ হয়ে রয়েছে—
আর পরিত্যক্ত কূপ, আর
উঁচু চূড়ার প্রাসাদ।"

বহু চেষ্টায়, বহু হোচট ও হুমড়ি খেতে খেতে আমি
আমার পুরানো আবাসস্থলে পেঁছিলাম। আমার ঘর
ভাঙা ইটের ঢিবির মতো উঁচু হয়ে আছে। আমি আমার
সন্তানদের নাম ধরে বিলাপ শুরু করলাম।

আমি কতক্ষণ কেঁদেছিলাম জানি না, হঠাৎ আমার
খুব খিদে পেলো। কখন, এক কেয়ামতের আগে আমি
অন্ন গ্রহণ করেছিলাম। এখন সূর্য হেলে পড়েছে।
আর আমিও বহু ভগ্নস্তূপের বাধা মাড়িয়ে,
অসংখ্য থেতলে যাওয়া মানুষের শরীর ডিঙিয়ে,
এখন ক্ষুধার্ত। আমার পা
ক্ষতবিক্ষত। উদরে,
আগুন। হৃদয়ে,
পুত্রশোক।

২

এক লুটিয়ে পড়া মহানগরীর দুমড়ে যাওয়া গলিপথে
ঘুরে ঘুরে ক্ষুধার্ত, নিঃসঙ্গ ইঁদুরের মত আমি
কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়ালাম। এখানে ছিল এক বিশাল প্রেক্ষাগৃহ
যা এখন একটি পরিত্যক্ত ইটখোলার মত ছত্রখান হয়ে
ছিটিয়ে পড়েছে।

এই প্রমোদভবনের পূর্বপার্শ্বে যেখানে একটি অতিকায় কামান ছিল,
কালে খাঁর সেই বিশাল কামানটিকে অনড় আর অখণ্ডভাবে
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, আমি আনন্দে
কেঁদে ফেললাম। আমার স্বজাতির অন্তত একটি চিহ্ন
এখনও অটুট আছে। এই কামান দেখে বুঝলাম,
এক মৃত মহানগরীর নগ্ন নাভিমূলে, আমি
পবিত্র গ্রন্থ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কামানটিকে আমার
পরমাত্মীয় বলে বোধ হল। যেন
আমার আদিতম পূর্বপুরুষদের কেউ
আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

কাছে গিয়ে সেই বিপুলকায় লৌহ দানবের গায়ে হাত রাখলাম।
না, একেবারে নিখুঁত নয়। এর ভিতেও মহাকম্পন
তার আঙুল বুলিয়েছে।
যে দিকে তাক রেখে সে উন্মুখ হয়ে ছিল,
সে ভিতও যেন অদৃশ্য চোট খেয়ে খানিকটা
অন্যমুখী হয়েছে। আমি তন্ন তন্ন করে দেখছিলাম !
ব্যারেলের শেষ প্রান্তে, যেখানে মুখটা হা খোলা,
সেখানে পৌঁছতেই তাজা বারুদের গন্ধে আমি চমকে উঠলাম।
এখানে বারুদের গন্ধ কেন ? আমি লৌহদানবের মুখের কাছে
মুখ আনতেই, এক অভাবিত দৃশ্যে শরীর কাঁপতে লাগলো।
এযে গোলাম ঠাসা একটি জীবন্ত কামান !
তেলে ভেজা পলতেটি পর্যন্ত আচ্ছাদন ভেদ করে
মর্মস্থলে ঢুকে আছে !

এভাবেই আমার পূর্ব পুরুষরা গোলা নিক্ষেপের জন্যে
তাদের কামানগুলোকে প্রস্তুত রাখতেন।
তবে কি আমাদের নগরনাশের মূল কারণ এই আদি বন্দুক থেকে
উৎক্ষিপ্ত হয়েছে ? আমার প্রশ্নের জবাব কে দেবে ?
এখানে একমাত্র আমি ব্যতীত, প্রাণের সাড়াশব্দ নেই।
যদিও কামানটি পুনর্বার গোলাবর্ষণের জন্যে মুখ ব্যাদান করে আছে
তবু এই প্রস্তুতিতে কোনো মানুষের স্পর্শ আছে বলে
আমার বিশ্বাস হলো না।

বহুদিন আগে, এই আশ্চর্য কামান দেখার জন্যে আমি
কতবার সদরঘাট গিয়েছি। দেখতাম,
গ্রাম থেকে আসা বধূরা এই বিপুল লৌহচোঙ্গকে তাদের
শিবলিঙ্গ ভেবে, পুত্র কামনায় সিঁদুর মাখিয়ে দিচ্ছে।
আজ পূজাহীন অবমাননার কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে
তবে কি এই মহালিঙ্গ
নিরীহ নগরবাসীর ওপর মহাক্রোধে অগ্নিময় রেতপাত করলো ?

উদ্ভট চিন্তায় টলমল করতে করতে, আমি অপদেবতার মত
কামানটি যেদিকে মুখ উঁচিয়ে ছিল
বহুদূর পর্যন্ত সেদিকে তাকাতেই, এক অবমাননাকর দৃশ্যে
মুষড়ে পড়লাম।
হায়, আমাদের হাইকোর্ট, সুবিচারের সর্বোচ্চ প্রতীক ও ন্যায়দন্ড,
তোমার কী দশা হয়েছে ! তোমার বহু কক্ষ বিশিষ্ট
বাহু ও বিতান আজ কোথায় ?
তোমার স্থানচ্যুত গম্বুজটি এমনভাবে হেলে কাত হয়ে আছে,
দেখলে মনে হয়, কোনো মহামান্য প্রাজ্ঞ বিচারপতি
এক অসতর্ক মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ায়
তার কুঞ্চিত শ্বেতশুভ্র উইগ, মাথা থেকে মুখে এসে পড়েছে।

তবু আমার মনে হলো, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কাত হয়ে পড়া
গম্বুজটিই বুঝিবা খানিকটা উঁচু হয়ে আছে।
আমি আর সইতে পারছিনা। নিঃস্তব্ধতা ও সম্বোধনহীনতার মধ্যে

যে অবমাননা রয়েছে, আমাদের মহিমান্বিত আদালতকে
তা-কি অবহেলা করছে না ?
আমার মধ্যে আদি বাঙালিদের যে প্রাগৈতিহাসিক বর্বর রক্ত ছিল
তাতে কে যেন এক বিচূর্ণিত গন্ধকের বাটি উবুড় করে দিল।
আমায় হৃদয় এখন একটি প্রদাহের স্ফোটক ছাড়া আর কিছু নয়।
আমি ভাবলাম, যুদ্ধরত সেনাপতি যেমন
তার আহত অশ্বকে মৃত্যুযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিতে
গুলিবর্ষণ করে, আমিও তেমনি
ওই লাঞ্ছিত গম্বুজকে ধুলায় মিশিয়ে দিই না কেন ?
নৈশব্দের চেয়ে নিঃশেষ হওয়া কি ভালো নয় ? কিংবা
অসম্মানের চেয়ে মৃত্যু ?

আমি হেলেপড়া সে মহান গম্বুজের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে
মনে মনে বললাম, নৈশব্দ্য এই মহামান্য আদালতকে
যে অবমাননা করছে, ইওর লর্ডশীপ,
একজন ন্যায়নিষ্ঠ নাগরিক হিসেবে
আমি এর প্রতিকারার্থ সুবিচার প্রার্থনা করি।

ধ্বংসস্তূপের ইটের ওপর আমি ব্রাহ্মাণ্ডের ন্যায়-অন্যায় বিধানকারী
আমার ধর্মপুস্তক চুম্বনের সাথে স্থাপন করে
আবার কামানের কাছে ফিরে এলাম। তারপর ঢাকা নগরীর
অন্তিম সিগারেট, যা আমার পকেটে ছিল, ধরিয়ে নিয়ে
কাঠিটা কামানের তৈলসিক্ত পলতের ওপর নিক্ষেপ করলাম।
আগুন উদ্দীপিত হলো। আমি বললাম,
হে নাচিকেত অগ্নি, তুমি যে ঋত্বিকের নামে
জগতের যাবতীয় বিষয়কে দাহ্য বলে প্রতিপন্ন করো,
সেই উদ্দালক-পুত্র নচিকেতার শপথ, তিনি যেমন
যমের প্রলোভনকে অতিক্রম করেছিলেন, তুমিও তেমনি
আমার সম্মুখস্থ মহালিঙ্গের লৌহ আচ্ছাদন ভেদ করে
বারুদের উদরে প্রবেশ করো।
আমার কথায় আর বাতাসের আলোড়নে পলতের আগুন
'তথাস্তু' বলে কামানের নাভি স্পর্শ করলে,

আমি কানে আঙুল দিলাম। মনে হলো, বারুদ আর গন্ধকের
মহা ওঙ্কার ধ্বনিতে পৃথিবী বিদীর্ণ হলো যেন।

আমি কুণ্ডলীকৃত কালো ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে
ধ্বংসের ওপর রেখে আসা আল্লার আদেশ
বুকে তুলে নিলাম। মৃতের দুর্গন্ধ ওঠার আগেই
আমাকে কোথাও পালাতে হবে।

ফররুখের কবরে কালো শেয়াল

কাল শেষ রাতে চাঁদ যখন উল্টে গিয়ে নৌকোর মত
নিজের জোছনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে,
আমি ফররুখ আহমদের কবর দেখতে গিয়েছিলাম।
আমার পরণে ছিল দু'টুকরো শাদা কাফন, হাতে 'সোনালি কাবিন'।
আমি জেলে যাবার আগে তিনি আমাকে টেলিফোন করেছিলেন,
'আসিস্, তোর কবিতা নিয়ে কথা বলবো।'
আমি যাইনি।
যাইনি, কারণ ছন্দের আড়ালে আমি যে ছদ্মবেশ ধারণ করি,
সে আলখাল্লার বোতাম তিনি খুলে ফেলবেন, আমি জানতাম।
আমি নদীর সাথে নারীর,
শাকম্ভরী বাংলাদেশের সাথে আমার মায়ের
যে উপমা স্থাপন করেছিলাম,
তিনি তসবী ঘোরাতে ঘোরাতে তাতে ফু দিলে
মিকাইলের মুখ হয়ে যাবে। ভয়ে
আমি যাইনি।

আজ যখন তাঁর কবর দেখতে যাবার সময় যোগ্য পোশাক
খুঁজছিলাম, হঠাৎ মনে হলো, চিত্রিত শার্ট, সবুজ পাতলুন আর
আমার বাহারে জুতোয় তিনি পানের পিক ছিটিয়ে দেবেন।
ফররুখের সামনে দাঁড়াবার মত কোনো পোশাক
আমার আলমারিতে ছিলনা। আলনার জামা-কাপড়
শ্মশান থেকে কুড়িয়ে আনা মড়ার আধপোড়া আচ্ছাদনের মত
দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলো।

একবার ভাবলাম, আমি নেংটো হয়েই সেখানে যাইনা কেন ?
ফররুখ ভাইতো আমাকে একটা 'লেংটা শিশু' বলেই জানতেন।
আবার ভাবলাম, নিঃস্তব্ধ কবরগাহে নিমজ্জমান চাঁদতে
তিনি যদি আমার নগ্নতা দেখিয়ে দেন, আমি কোথায় পালাবো ?
আমি নিয়ম-কানুন মানিনা, কিন্তু বেশরা কবিতার জন্যে

তিনি যদি আমাকে নিসর্গরাজির সামনে বেয়াদব বলে গালি দেন,
আমি সইতে পারবো না।

শেষে আমি কাফনই পরে নিলাম।
১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের যে সব লোক
ঘরে কবরের কাপড় কিনে রেখেছেন, আমি
তাদেরই একজন।

আমি যখন তার কবরে আমার উপস্থিতি ঘোষণা করে
লাব্বায়েক, লাব্বায়েক বলে উঠে দাঁড়ালাম,
ঠিক তখুনি তার কবর থেকে একটা মস্তবড়ো শেয়াল
লাফিয়ে সরে গেল। কবি বেনজীরের বাড়ীর পাশ দিয়ে
শেয়ালটা পালিয়ে যাচ্ছে।

মনে হলো, শেয়ালটাকে আমি চিনি, আগে কোথাও দেখে থাকবো।
একবার বিদ্যাপতির স্মৃতি মন্দিরে অনেকগুলো শেয়াল দেখেছিলাম,
এ শেয়ালটা সেখানে ছিলনা।
আমি লালনশাহের মাজারে এক মারফতির উৎসব শেষে ঘুমিয়ে
পড়েছিলাম,
ঘুমের মধ্যে দু'টি শেয়াল আমার দেহ শুঁকছিল,
এ শেয়ালটা সেখানেও ছিলনা।
তবে শেয়ালটাকে আমি কোথায় দেখেছি ?
কিছুতেই মনে পড়ছে না।
কবরের কাছে একটা কালো গাছের দিকে চোখ পড়তেই
আমার স্মৃতির ওপর বিদ্যুৎ বইল।
হাঁ, পটুয়া কামরুলের চিত্র প্রদর্শনীতে এই শেয়ালটাকে আমি দেখেছিলাম,
কামরুলের কালোশিল্পের মধ্যে এই ধূর্ত লেজ উঁচিয়ে ছিল ;
সেই কুটিল চোখ আর লোভাতুর মুখচ্ছবি আমার চেনা।
আমি ফররুখের কবর পেছনে রেখে,
একটা কালো শেয়ালকে তাড়াতে তাড়াতে
বাংলাদেশের মানচিত্রের উপর দিয়ে
আমার কাফন নিয়ে দৌড়াতে লাগলাম।

একবার ডাকতেই

নদীকে ডেকেছিলাম বলে, নদী তার গতিপথ ছেড়ে
ঢেউ তোলে আমার আবাসে।
আমি প্রান্তরে হারিয়ে পথ, 'তাহেরা তাহেরা' বলে
এক গেঁয়ো যুবতীর নামে একবার ডাকতেই
আপন সংসার ভেঙে এসেছিল অসংখ্য যুবতী।
আকাশে হাঁসের ঝাঁক, ডাকলাম,
—পাখি, পাখি, পাখি,
একটি মালার মত নেমে এলো সমস্ত হাঁসেরা।

পোশাকে নদীর ফেনা, মাছের চোখের মত বুকে নিয়ে
চুম্বনের চিহ্ন কতিপয়
আমি যে পথেই যাই,
আমার পেছনে আসে
ক্রুদ্ধ জলের ঢেউ,
রক্তে ভেজা শাড়ি, আর
চকিত গুলির শব্দে ছিন্নভিন্ন
হাঁসের বেষ্টন।

শোন শব্দচোর ভাবের তস্কর

দেখায় কবির মতো, অথচ সে শব্দচোর, খ্যাতিতে প্রবীণ ;
সে আছে আমাকে ঘিরে আমারি ঝুলির দিকে চোখ।
যা আছে আমার কাছে, সবুজ পুঁতির মালা, আর
সুরভি ঘাসের বীজ, কিশোরীর ভাঙা চুড়ি, নীল নাকফুল ;
কালো পাহাড়ে মৃন্ময় বাসনকোশন, পুতুলের বৌ—
সে চায় চোরের মত কেড়ে নিতে। কিম্বা বুক মেলানোর ছলে
গোপন খঞ্জর তার হাতড়ে ফেরে—
বুকের কোথায় থাকে গ্রাম্য এই কবির ভোমরা ?
না, দেবো না আমি লাল শিলাজুত—এই পাথরের ঘাম ;
চোখের জলের টোপা—কারার আড়াল থেকে আনা ;
দেবো না পাখীর ঠোঁট, তক্ষকের চোখ ;
নদীর গভীর থেকে তোলা এই ছিনায়ের রুপোর চামচে
খেতে চাও ? দেবো দুধ, তবু এই
চামচ চেয়ো না।

শোনো শব্দচোর, শোনো ভাবের তস্কর
খ্যাতির চেয়ারে বসে লকলকে জিহ্বা তুমি যতই বাড়াও,
সাবধান, আমার ঝুলিতে আছে বেতসের কাঁটা, আছে—
খাকোশ মাছের পাকা লেজ।
পাগলা মৌমাছি আমি পুষেছি ঝুলিতে,
আমার সংগ্রহে আছে ছুঁৎরার পাতা আর
বাঁদরহুলার কিছু ফল।

ক্ষমতা যখন কাঁদে

খাঁচার সিংহের মত যখন সে কাঁদে, আমি
বালিশে হেলান দিয়ে শুনি সেই শক্তির রোদন।
আঁ আঁ আঁ শব্দে তড়িতের কান্না যেন
তারে তারে বয়ে গিয়ে
আলোর আপেল হয়ে ঝুলতে থাকে তামার রজ্জুতে।
পাথর হেঁচকি তোলে,
ইটের ফোঁপানি এসে খুলে ফেলে
আমার খড়খড়ি।

সব ইমারত নত, সেজদারত ঘরবাড়ীর ঘাড়ে
নেমে আসে চাঁদ। যেন
শেষ আদেশের আগে
ইস্রাফিল জিভ দিয়ে চাটলেন, কম্পমান
তাঁর দুই ঠোঁট।
রাতের বিমান যায়, মনে হবে
বি-বি'র ধাতব বগা নিজের পালক ঠুক্‌রে
ডুক্‌রে ওঠে উত্তর আকাশে।

ক্ষমতা যখন কাঁদে,
দাঁড়ানো দালান কোঠা গলে যায়
ইট ও লোহার সন্ধি নড়ে গিয়ে
আঁঠা হয়, জল।
শিল্পীর কর্তিত কান ইঁদুরেরা ফেলে যায়
কবির খাতায়। আর
প্রায়ান্ধ কবির মত আমি
তামাককৌটোর খোঁজে হাতড়ে হাতড়ে তুলে আনি
সদ্যকাটা ভ্যানগগের কান।

সবুজে ঈমান

তোমার শাড়ির দিকে চোখ গেলে বেড়ে যায় সবুজে ঈমান
এখনও বুকের কাছে ধরে আছো পাথরকুচির ক'টি পাতা ?
হোক তা চিত্রিত লতা, পোশাকের মুদ্রিত বাগান,
তবুও তোমারি মধ্যে গুল্মময়ী মানুষের মাতা—

আমাকে দেখায় ফল লোভন পাতার নীচে লাল
আর আমি দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানবিনাশী ক্লোরোফিল
যখনই ধরতে যাই সেই গাছ, অতিরিক্ত ডাল,
'পাঠ করো' —ব'লে ওঠে নামুস জিব্রিল।

হ্যাঁ আমি জেনেছি বটে এক বিন্দু রক্ত থেকে আমি
এসেছি তোমার কাছে—এখন যা দমনীয় নয় :
আমার অক্ষর বুঝি আমার মতই দ্রুতগামী

নগরে প্রচার করে পরিপূর্ণ পল্লবের ভয়।
অথচ ঘুমের মধ্যে কারা যেন, মানুষ না জিন
আমার কবিতা প'ড়ে ব'লে ওঠে, আমিন, আমিন।

প্রকৃতি ও পুরুষ

এখন কোথায় তুমি ? নামে জল, হে স্পষ্টভাষিণী,
হাওয়া তার কথা রাখে, শপথ ভাঙে না কোনো ঋতু ;
ঝির্ঝির ঝঙ্কার বলে, বলো দেখি, আমি আসিনি ?
কেয়ার কাঁটার ফাঁকে ফোটে ফুল ; তুমি ভীতু, তুমি শুধু ভীতু।

স্মৃতির চিরুণীখানি পড়ে আছে পুরুষের দর্পণের পাশে
তাতে কোন্ চিহ্ন লেগে ? ছিন্ন কেশ, দেখো কার কেশ ?
প্রজাপতি ভেঙে গিয়ে জলো, হিংস্র, দর্পিত বাতাসে—
উড়ে আসে ; আর তুমি, তুমি ভাঙো তোমারি আদেশ !

গন্ধ ও জলের দাগে ভরে আছো কি করে দেয়াল ?
প্রশ্ন করে চেয়ে দেখি ভাঙা সেই আতরের শিশি
এখনও টেবিলে আছে। গন্ধ তবে বর্ণময় ? নাকি গাঢ় লাল ?—

তুমি কি বাঙালী নও, ভূগোলে অচেনা এক দিশী ?
প্রকৃতি আমাকে শোষে মেদমাংসে, আমি তো কাঁদিনি,
রক্ত হয় বারিধারা, মজ্জা ঘাস, লো মিথ্যাবাদিনী !

ফুলের অভয়

তাজনীন ইসলাম লুসীর বিয়েতে

গৃহের মঙ্গল হয়ে তুমি যাবে বন্ধনের কাছে,
তোমার মিলন যেন নদীর সন্ধির মত হয় ;
শুনেছ, পুষ্পের রাজ্যে এখনও যে সে নিয়ম আছে
সবুজের সাধ্যমত ফোটায় সে ফুলের অভয়।

তুমিও মাতাও তাকে অর্চনার আকুল বাতাসে,
তোমার শাড়ির মধ্যে তুলে নাও স্বপ্নের বাগান,
আশার পাখিরা যেন সে উদ্যানে ফিরে ফিরে আসে,
তোমাকে শুনিয়ে যায় প্রকৃতির মঙ্গলের গান।

দুঃখও আসবে বটে তার কালো পালক ঝরিয়ে,
তোমার আঙুল যেন বেছে নেয় চিহ্ন কতিপয় :
যে কাবিন স্পর্শ করে আজ হবে তোমাদের বিয়ে
এরি গাত্রে লেখা আছে যৌবনের প্রথম বিজয়।

আনন্দে উদ্যত নয়, হে যুবতী, নত করো খোপা
তোমার কল্যাণ হোক, নত হও আনন্দস্বরূপা।

ম্যাক্সিম গর্কি স্মরণে

ক্ষোভে বেঁকে আসে হাত, অমলিন হে মুখাবয়ব
আর কত ধরে থাকি রক্তবর্ণ হৃদয় আমার ?
মানুষ, মানুষ আর চতুর্দিকে মানুষের স্তব
একদা বাজিয়েছিলে দীর্ণ দুঃখের আঁধার।

ক্ষমা, ক্ষমা বলে কাঁদে মহত্তর কার কণ্ঠস্বর ?
জানি, ক্রুশ কাঁধে নিয়ে কোথায় যাবেন টলস্টয়।
পেশকভ দেখুন চেয়ে আমাদের চক্ষের ওপর
শেকভের শোকার্তরা তুলে ধরে নিজের হৃদয়।

আমাদের জননীরা আপনার 'মা'য়ের মতই
অপ্রেমের সর্বগ্রাসে যেন আদিগন্ত স্নেহ ;
সন্তান হত্যার যজ্ঞে রাস্তায় বাঁধলে হৈ চৈ

যখন বিশ্বাস ভাঙে, গ্রামে গ্রামে ঘনায় সন্দেহ
বাংলার মায়েরা হয় পাভেলের মায়ের মতই
ত্যাগ-তিতিক্ষায় দেখো, মিছিলেই কেঁদে ওঠে কেহ।

কৃষ্ণকীর্তন

শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব বন্ধুবরেষু

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে শুধু বেজে ওঠে বাঁশী,
দু'কানে আঙুল রেখে দাঁড়াবো কি কদম্বের মূলে ?
হে শ্যামল, সত্য হও, সুর নয় শরীরধারণে
আমাকে মজাও প্রভু, দাও স্পর্শ, ধরো আলিঙ্গন।
রাধা, রাধা এত সেধে সমাজ সংসার নিলে কেড়ে
কাঁপা হাতে ধরি যদি ভেঙে যায় ঘরের তৈজস
ভাতের বাসন থেকে মুখ তুলে ঘরের মানুষ
যখন নিমক চায়, কলঙ্কিনী এনে দিই জল !
এ পোড়া দেশে কি প্রভু নদী এসে ঘুমেও ফুস্‌লায় ?
কেন বা ঢেউয়ের মধ্যে ছল-ছল করে শ্যামনাম,
কলস বুরাতে গিয়ে চোখ ভরে পানি নিয়ে এসে
উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখি ঘরে ঘরে পড়ে গেছে খিল।
তবে কি অকূলে যাবো ? সর্বনাশী যমুনারই কাছে—
খালি ঠিলা দেখে যেথা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ জপে ওঠে জল ?

চাঁদের দিকে

মানুষের প্রথম চাঁদে অবতরণের পূর্বক্ষণে

কেবলই স্বপ্নের চেয়ে দ্রুতগতি হয়ে ওঠে আমাদের পা।
পেছনে হাঁপায় মৃত্যু, যেন এক হতভম্ব বুড়ো
দুঃসাহসী আত্মাদের মস্ত বড়ো ঝুলি কাঁধে নিয়ে
ম্যাগেলানের জাহাজ থেকে কাপ্তান কুকের জাহাজে
নত হয়ে কুড়োয় জীবন।

কার পদপাত শুনি ? কে তোমরা ? যাবে কতদূর ?

আমরা পৃথিবী থেকে নির্বাতাস নক্ষত্রের দিকে
ভাসিয়েছি তরী। স্বপ্নের কুয়াশাময় জ্যোৎস্না থেকে আজ
কর্কশ সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছি মানুষের আশার জাহাজ।
ঈথারের ঢেউয়ে রেখে আমাদের লবণাক্ত নিঃশ্বাসের কণা
যাচ্ছি চাঁদে। পৃথিবীর কবি যাঁরা, যাঁরা এতদিন
আমাদের প্রার্থিত রমণীর সুন্দর মুখের সাথে এ-গ্রহের দিতেন উপমা
আমরাও যাচ্ছি সেখানে। টানহীন মহাশূন্যলোকে
যে লোভ বিস্তার করে নিসর্গের সোনার ছেলেরা.
ক্রমাগত উঠে গিয়ে সেই সৌর-সম্বিতের মাঝে
কেবল হাঁট্‌তে চাই অন্য নব তারকারাজিতে।

হায়রে কবিতা. দেখো. এখনোও মেলে আছে দল !

গন্ধহীন. বায়ুহীন. শব্দহীনতায়—
ম্লানস্পর্শে মেলে দিলো সংগোপন আচ্ছাদনখানি :
আর যতদূর চোখ যায়
দেখা যায়, সৌন্দর্যের মহাবিভীষিকা

পৃথিবী নিজেই আজ কলম্বাসের নাও হয়ে,

হে নভোচারীরা-

দোল খাচ্ছে পলকে পলকে। স্পর্ধায় পা তুলে কখন
তোমরা দাঁড়াবে রুক্ষ চাঁদের মাটিতে। আমরা সবাই
ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে আছি আশঙ্কার বুকজল নদীতে, নীরবে।
আর শুধু বুক দুলছে,
বুক দুলছে,
বুক দুলছে,
ভাই।

অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না

হযরত মোহাম্মদ

আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হোক তাঁর ওপর

গভীর আধাঁর কেটে ভেসে ওঠে আলোর গোলক,
সমস্ত পৃথিবী যেন গায়ে মাখে জ্যোতির পরাগ ;
তাঁর পদপ্রান্তে লেগে নড়ে ওঠে কালের দোলক
বিশ্বাস নরম হয় আমাদের বিশাল ভূভাগ।

হেরার বিনীত মুখে বেহেস্তের বিচ্ছুরিত স্বেদ
শান্তির সোহাগ যেন তাঁর সেই ললিত আহ্বান,
তারই করাঘাতে ভাঙে জীবিকার কুটিল প্রভেদ
দুঃখীর সমাজ যেন হয়ে যাবে ফুলের বাগান !

লাত্-মানাতের বুকে বিদ্ধ হয় দারুণ শায়ক
যে সব পাষাণ ছিল গঞ্জনার গৌরবে পাথর
একে একে ধসে পড়ে ছলনার নকল নায়ক
পাথর চৌচির করে ভেসে আসে ঈমানের স্বর।

লাঞ্ছিতের আসমানে তিনি যেন সোনালি ঈগল
ডানার আওয়াজে তাঁর কেঁপে ওঠে বন্দীর দুয়ার
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় জাহেলের সামান্য শিকল
আদিগন্ত ভেদ করে চলে সেই আলোর জোয়ার।

আমার উদ্যোগ

কোনো উদ্যোগই আর প্রস্ফুটিত হয় না।
বীজ বপনের ক্ষেত্রগুলোও আমি ভুলে গেছি
যেমন চাঁদে পাওয়া চাষী ভুলে যায় নিজের কর্ষিত ভূমি
অনেকটা তেমনি।

অথচ দারুণ আবেগে উর্বরতা আমাকে ডেকেছিল
আমার শরীর ছিলো ঋজু, বহু দক্ষ
চোখ ছিল উদয়কালের আকাশের প্রায়।
আর দেখো, আমি নেমে গেলাম চরদখলের লাঠিয়াল
আমার শস্যক্ষেত্রে যেমন ইচ্ছা গমন করবো বলে।

আজ মনে হয় কত জমিন আমি মাড়িয়ে এসেছি।
কত আইলকে দীর্ণ করেছিল আমার লাঙল,
কত শস্যভারে নুয়ে পড়েছিল আমার বাগিচা,
কেন তবে অবনত কিষাণের মত আমার ঘরে ফেরা হলো না।
কেন ? কেন ?

আজ সমগ্র শস্যক্ষেত্রের নামই আমি ভুলে গেছি
ভুলে গেছি বৃষ্টির মাসগুলো কখন আসা-যাওয়া করে—
দেহ নুয়ে পড়েছে, হাত উদ্যমহীন। আর চোখ ?
হায়রে আমার চোখ ঘোলাজলের গর্তে হারিয়ে যাওয়া
শিশুর মার্বেলের মত নিখোঁজ।

হৃদয়ের একদিকে

হৃদয়ের একদিকে গোল হয়ে রয়েছে বেদনা।
উপশম খুঁজে আমি নাগালের সমস্ত গাছের
মূল উৎপাটন করে নিংড়ে রস লাগিয়েছি বুকে।
ওষুধের সাধ্য নেই, প্রকৃতি পারে না দিতে আর
আহারের রুচি, ঘুম, স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে যাওয়া।
বারান্দার এক কোণে বসে আছি অচিকিৎস্য, কালো।
স্পর্শ দাও হে বাতাস দক্ষিণের উলঙ্গ বাতাস
দাও হাত এইখানে হৃদয়ের বামে, এইখানে
যেন চোখ মুদে আসে স্বপ্নে ভাসে চুড়ির আওয়াজ।
না, নিদ্রা চাইনা আমি। নিরাসক্ত ব্যথা ও বিস্বাদ
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে যাক। দেখা যাক কেমনে সে চায়
আমাকে আরাম দিতে, নিয়ে যেতে আমার স্পন্দন।

অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না

আমরা এখন আমাদের চুল্লীর চারপাশে
গোল হয়ে বসে পড়েছি। মশলার উষ্ণ স্বাদু গন্ধে
আমরা রূপকথার ঘোড়সোয়ারদের মতই টগবগ করছি।
কে যেন আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন
রহস্যময় হাসির বিদ্যুৎ। আর চুড়ির শব্দ
যেন অন্ধকার গেলাফের ওপর রূপোর কারুকাজ।

আমরা একটু পরেই খেতে পাবো।

মাংসের প্রতিটি রগরেশা, হাড় আর সরুয়ার ফোঁটা
আমরা সমানভাগে ভাগ করে ফেলবো।
কাঁচা পেয়াজ খেয়ে যারা প্রার্থনায় যায়নি
আমরা তাদের জন্যই অপেক্ষামান।

একটু আগেও আমরা ছিলাম বিদ্বেষে অন্ধ,
ক্ষুধার্ত, পরস্পরকে দোষারোপে হিংস্র,
আমাদের খাবার ছিল না, ছিল না জ্বালানি
মুগ-মুসুর অথবা মাংস। ঘরে আগুন নেই
অন্ধকার আমাদের প্রায় ডুবিয়ে রেখেছিল।
আর আমাদের শিশুরা এমন যে, শুধু
কালো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। কারণ
কিছু না জুটলেও আমাদের ধৈর্যধারণ করতে
বলা হয়েছিল।

সালাত ভাঙলো। আমিন, আমিন—
প্রতিটি মসজিদ থেকে তারা বেরিয়ে পড়েছেন। যেন কেউ
ওমরের গণকোষাগার থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন
হিসেব করা দীনার।

আমরা যে পদশব্দের জন্য অপেক্ষা করছিলাম
বুঝিবা তিনি নিকটবর্তী হলেন। পৃথিবীর আহার্য
ঠোঁটে নিয়ে যেমন পাখিরা ঘরে ফেরে, তেমনি।
তার স্থির সুন্দর হাসি
যেন নাজ্জাসীর দরবারে দণ্ডায়মান জাফর
কিম্বা রেহেলের ওপর বিশ্বাসীর কোরান মেলে ধরা।
তিনি চুলার পাশে প্রাত্যাহিক সংগ্রহ সাজাতে সাজাতে
আল্লার প্রশংসা করলেন। আর আমরা
চারপাশে গোল হয়ে এগিয়ে এলাম।
আমাদের অদৃষ্টের ভেতর থেকে এখুনি যে শিখা
লক লক করবে, আমরা সে আলোয় পরস্পরকে
চিনে নিতে চাই।

কিছু মনে নেই

কাল আমি আমার মা'র সাথে অনেকক্ষণ কথা বলেছি ;
অদ্ভুত বৃদ্ধা। একদা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন। সম্ভবত
এখন বিশ্বাস হতে চায় না। যখন মিটমিট করে
আমাকে দেখলেন। আমার গরম লাগছিল।
আমি বললাম, চলো মা আমরা একটু চা খাই .
বুড়ি হেসে তসবীহ্ টিপতে লাগলেন,
তোর যেখানে জন্ম হয়েছিলো, মনে আছে ?
নিম গাছের নীচে ছনের চালায়। সে রাতে
আমাদের একফোঁটা চা-ও ছিলো না।
আমি কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম,
না মা, কিছু মনে নেই।

পেঁচার ডাকে আমার ভয়, এদিকে তোর কান্না
ঘরে নেই পুরুষ। তোর বাপ গেছে চরের ধান
পাহারা দিতে। কে-যেন আজান হাঁকলো
হাজী শরিয়তের মত গলা। ধাই মেয়ে
তোকে দোলাতে দোলাতে বললো,—
বল লেংটা তুই কোন মসজিদে যাবি ?—
মনে আছে ?

না মা, আমাদের কাপ জুড়িয়ে
পানি হয়ে গেল যে !

দ্বিধা

আতশবাজির অর্থহীন উত্থানের মত
কে যেন কেবলি বলে যাচ্ছে, মাতাও মাতাও
আশাকে জাগিয়ে তোলো। আর সাঁই সাঁই শব্দে
আমার কান কালা হয়ে গেলো।

তিনদিন তিনদফা সাবধানবাণীর পর
এখন এই ভর সন্ধ্যায় বাড়িঅলা
ইলেকট্রিক তার কেটে দিয়েছে।
ঘরের ভেতর হুটোপুটি আর শিশুদের কান্না
আমি একটুকরো মোম খুঁজতে উঠলাম।
আমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছিলাম
মনে পড়লো।

বালিশের পাশে আমার ছেলেদের
হাতড়ানোর শব্দ। তারা দেশলাই খুঁজছে
অন্ধকারে তাদের অনুসন্ধান
জলস্রোতে হাত ছুঁইয়ে রাখার মত
মৃদু শব্দ তুলে থমথম করতে লাগলো।

আমি আন্দাজে টেবিলের টানা ধরে টানলাম
অন্ধকার গর্তের ভেতর হাত বাড়ালে
মাংসকাটার ছুরিটা হাতে বাজলো। আমি
ধারালো ইস্পাতকে পাশ কাটিয়ে
আধপোড়া মোমটা খুঁজতে খুঁজতে
দৈনন্দিন কাজের হাতুড়িটা টেনে আনলাম।
কেমন ঠান্ডা আর মজবুত।
কত উদ্যমের সময় একে কাজে লাগিয়ে
আমি আনন্দ পেতাম।
তারপর দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বললো

আমার সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটির হাতে
একবিন্দু আগুন। পাশে কয়েকটি রক্তাভ মুখ
আমি মোম খুঁজে না পেয়ে কর্তব্যবিমূঢ়ের মত
একটা শিশুর হাতের দিকে অসহায়ের মত
তাকিয়ে আছি। অথচ আমার সামনে
রবীন্দ্রনাথের বই,
গেটের প্রেমপত্র,
কনফুসিয়াসের দর্শন। যা অনায়াসে
এই আগুনকে স্থায়ী রাখতে পারে
আর দেয়ালজুড়ে পৃথিবীর মানচিত্র
আইল বাঁধা জমির মত বিচিত্র এবং দাহ্য।

একটা শিশু আর কতক্ষণ এই
দ্রুত দহনশীলতাকে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।
দ্বিধায় আমার হাত কাঁপতে লাগলো।

দারিদ্র্য ও অসহায়তার অন্ধকারে
জ্বলে উঠেছে যে আগুন
অবশেষে তা পানির ভেতর পাথরের নুড়ির মত
নিঃশব্দে ডুবে যাচ্ছে।

ইহুদীরা

অনিষ্টকর অন্ধকারে যখন পৃথিবী
আচ্ছন্ন হয়ে যায়। চারদিকে ডাইনীদের
ফুৎকারের মত হাওয়ার ফিসফাস,
আর পাখিরা গুপ্ত সাপের আতঙ্কে
আশ্রয় ছেড়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়
ঠিক তখুনি, ইহুদীরা হেসে ওঠে।

ভাবো, নদীতে পানি নেই। পাপপ্রক্ষালণকারী
পয়গম্বরের কাটা মাথা থেকে রক্ত ঝরছে
তখন কারা কায়সারের মুদ্রা চালু করতে চায় ?

পর্বতের আলো তুমি স্পর্শ করার আগেই
এরা পশুর মূর্তির কাছে মানুষের মাথা
ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। আহা
কোন বালুবেলায় হারিয়ে এসেছো
খেয়াঘাটের দশটি কড়ি ?

না, ফারান পর্বত থেকে আলো আসছে।
আল্লার অশ্বের সোয়ারী পার হয়ে যাচ্ছেন
সমস্ত রহস্যের দরোজা। তার হাতেই
শেষতম বাণী। পৃথিবীর আগের
পৃথিবীর পরের। আর পৃথিবীতে
বসবাস করার।

ইহুদীরা হাসুক,
তবু সম্পদের সুষম বণ্টন অনিবার্য।
ইহুদীরা নাচুক, তবু
ধনতন্ত্রের পতন আসন্ন। আর

মানুষ মানুষের ভাই।

শ্রাবণ

এক ধারাবর্ষণের সন্ধ্যেবেলায় ভাবনা একটি
ভেজা পাতার মত দুলতে লাগলো।
কেন জানি মনে হলো, এসো মৃত্যুর কথা ভাবি।
মাঠের ওপাশে কবরগুলো বৃষ্টির ধোয়ায়
আবছা শান্ত হয়ে আছে। মনে হয়
নিঃশ্বাস ফিরিয়ে দিলেও এদের কেউ পৃথিবীতে
বাস করতে চায় না।

কত মৃত্যুর কথা মনে পড়তে লাগলো
পিতা-পিতামহদের মৃত্যু অপরিচিতদের মৃত্যু
পাখির নিঃসীম ওড়াওড়ির মত।

সেই ঘর সেই বারান্দার কথা আজও ভুলিনি
ওষুধে অরুচি, বললে, কেয়াফুলের গন্ধে বমি আসে
বাতি নেভাও।

বাইরে ধারাজল ভেতরে অন্ধকার
বাতাসে কোথাও এলিয়ে পড়লো লতাকুঞ্জ
আর শেষবারের মত তোমাকে দেখলাম,
শাদাশাড়ি ঘোমটার আড়ালে মুখ
সামনে বেহারাহীন পর্দায় ঢাকা কালো পাল্কি।

লবিদের কথা

লবিদ ছিলেন আলোর পথে পদচারণাকারী
একজন সত্যিকার মানুষ। একজন কবি।
তিনি আল্লার সত্যবাণী ও মানুষের কণ্ঠস্বরের
পার্থক্য নির্ণয় করেছিলেন। তিনি জানতেন
কালস্রোতের কাছে মানুষের কথাও নিষ্প্রভ
হয়ে আসে। মানুষের সৌন্দর্য দেখে তিনি
হাসতেন। কীর্তি ও ঐশ্বর্যে তার ভ্রূ কুঞ্চিত হতো। আর
নিজের কবিতার জন্যে তার লজ্জার সীমা ছিলো না।

বলতেন, কিছুই যখন দাঁড়াবে না তখন আমার
অবনত হয়ে থাকাই ভালো। অবনত
সেই বিনাশহীন সত্যের কাছে
যেখানে সকল বিতণ্ডাকারী কবিরা
নির্বাক হয়ে ফিরে যায়।

সত্যরক্ষার তাগাদা

তুমি একবার বলেছিলে কবির প্রতিশ্রুতির
কোনো স্থায়ী মূল্য নেই।
তোমার শরীরে বাগানের গন্ধের আভাস।
দেখলাম একগুচ্ছ ফুল নিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে আছো।
চোরকাটায় শাড়ির পাড় বিধ্বস্ত। তোমার মুখ
প্রজাপতি হত্যাকারী কিশোরীর মত উত্তেজিত।

আমি আমার উপমার সপক্ষে জগতের
কত কবির উদভাবনাকে করতলে সজ্জিত
করতে চেয়েছি।

কুসুমের আয়ু সম্বন্ধে তোমার মত সজ্ঞান নারী
তুমি কি সত্যরক্ষার তাগাদা না দিলে
পারতে না ?
আমি কোথাও দেখিনি। অথচ
বাগানের ফুল তুলতে তোমার হাত
কাঁপে না কেন ?
দেখো, তোমার নোখ পুষ্পের পরাগে
নীল হয়ে আছে। তবুও এক কবির

বাতিল দুটি শব্দের জন্য তুমি পাণ্ডুলিপি
অপহরণ করলে ?

দেখেছি, সব নারীই যৌবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নির্বাক।
অথচ প্রায় মিটে যাওয়া একটি সনেটের জন্য
এমনভাবে চুল বাঁধলে, মনে হলো
কবিতাকে নিভিয়ে ফেলতে তুমি
শত সন্তানের জননী হবে।

ভারসাম্যহীন মানুষ

যে সব ভারসাম্যহীন মানুষ সত্যের চেয়ে
স্বপ্নকে বড়ো বলে ভাবতো, একদা
আমি ছিলাম তাদের দলে।
আজকাল বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে পর্যন্ত
সাহস হয় না।

একেতো অন্ধকারে স্বপ্নের উৎপাত
তার ওপর জানালার পাশে অদ্ভুত শব্দ
কারা যেন কিছু একটা ধীরে সুস্থে কাটছে।

চোর ? না জানলার কাছ থেকে ফিরে আসি।
ঘুন ?
কই. আসবাবপত্রে হাত বুলিয়ে বসে পড়ি।
নিজের ঘড়ি আর হৃদয়ের শব্দ আমার অচেনা নয়,
তবুও কেউ কিছু কাটছে।

অন্ধকারে নারীর আনন্দ ও শিশুর নিঃশ্বাসকে
আমি পার হয়ে এসেছি। এ করাতের শব্দ
দৃশ্যমান অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে
উঠানামা করছে।

ভয়ে, বেদনায় আমি
আলোর জন্যে বিদ্যুতের বোতাম খুঁজতে
দেয়ালে, পৃথিবীর মানচিত্র খাঁমচে ধরলাম।

আদি সত্যের পাশে

আদি সত্যের পাশ দিয়ে একটা নদী বইছিল
আমি সামান্য মানুষ, নদীকে বললাম, থামো
আর দেখো, উতরোল জলস্রোতে
কাঁপতে কাঁপতে নিশ্চল সত্য
কত অনায়াসে ডুবে গেলো।

নিমজ্জিত সত্যের ওপর এখন কালান্তক ঢেউয়ের বুদবুদ
পাখি উড়ছে। কোয়াক্ কোয়াক্ করে ডাকছে
একটি যাযাবর হাঁস। এক মাঝি
পালের দড়িদড়া ঠিক করতে করতে
গাইলো, 'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।'

দেখলাম,
বানের জল এমন ঘোলা যে
হারিয়ে যাওয়া নাকফুলের হদিস করতে
আজ আর কেউ নদীতে নামবে না।

বিশ্বাসের চর

আর উপশম নেই, তবু এই ব্যথার বিষয়
তোমাকে জানাতে বড়ো সাধ আজ জেগেছে হৃদয়ে
এই তবে ভালোবাসা ? এই নাকি প্রেমের গুঞ্জন—
দেয়ালে তোমাকে দেখে কেঁপে ওঠা আপাদ মস্তক ?

আমাকে ফিরতে হবে। বাঁধাছাদা হলো না এখনও।
কে তুমি নৌকার মাঝি ধরে আছো মাস্তুলের দড়ি
ঢেউয়ের মাতন দেখে ভুলে গেছি কোন দিকে যাবো
কোনদিকে, কোনদিকে—কোনদিকে বিশ্বাসের চর ?

আমার ফেরার দিন, কথা ছিলো বিদ্যুতের লেখা
কেবল তোমার মুখ এঁকে দেবে শূন্য নীলিমায়।
নদী এসে ডাক দেবে। আদিগন্ত বৃষ্টির ধনুক
বহুবর্ণ তীর ছুঁড়ে গেঁথে ফেলবে আমার নয়ন।

নেমে এসো হে অন্ধতা। ভুলে গেছি নিজের কি নাম :
কি নামে ডাকতো লোকে, কোন গ্রামে ছিলো পিতৃকুল ?
আজ শুধু হাওয়া থাক, আর কালো মেঘের গর্জনে
একটি মস্তুল শুধু ভেসে ভেসে দূরে চলে যাক।

এমন একটা সময়

এখন এমন একটা সময় যখন দিন ও রাত্রির আবর্তনকে
আমি যুক্তির দ্বারা সাজিয়ে নিতে চাই।
আমার যৌবনে আমি যেমন জীবনের প্রতিটি সন্ধিস্থলকে
প্রশ্ন করেছিলাম।
কবিতার মিল
নর-নারীর দেহগত সম্মিলন
পাখি ও পতঙ্গের জোড়া বেঁধে থাকা
পুষ্পের প্রস্ফুটন আর
নদীর বহতা গতিকে,
আজ সেই প্রশ্নমালাকে ঘুরিয়ে ধরলাম আকাশের দিকে।

এইতো এখন আলো অপসারিত হচ্ছে
হেরা পর্বতের পাশে
আমার পায়ের নীচে পাথরের মধ্যে যে উষ্ণতা
এই আরামের জন্য আমার প্রার্থনা।

আমি এখন মাথা নুইয়ে আছি।
লোহিত সাগর পার হয়ে আফ্রিকার মধ্যস্থল থেকে
ধেয়ে আসছে অন্ধকার।...
ঠিক এই মুহূর্তে দিনরাত্রির অবর্তনকে
আমি সাজিয়ে নিয়ে উদ্যোগী হয়েছি।

প্রভু, আমার গতি কোন্ দিকে ?
আমি এখন কোথায় যাবো। বহুকাল যাবত
আমার কোন ঘর নেই। মানবিক নির্মাণের প্রতি
আমি আস্থা হারিয়েছি।
পৃথিবী আমার কাছে বেদুইনের হাসির মত
ঠা ঠা করতে লাগলো।

নীলের শিথানে

যে শাদা দেখি ঐ বকের পাখাতে
সে রঙ চায় ওকি আকাশে মাখাতে।

বোঝে না পাখি সে কি নীলের শিথানে
কি ফুল ফুটে আছে আকাশ-বিতানে ?
আলেয়া ঝিকিমিকি সন্ধ্যাতারাতে।

যে নদী বয়ে যায় মনের অতলে
কে গোণে ঢেউ তার রূপালি সে জলে।

কে আঁকে বনে ঐ সবুজ কাহিনী
লাজুক চোখ তুলে আজও তো চাহিনি,
কি মায়া আছে ঐ সেগুন-শাখাতে।

অবলোকন

জীবন যেন পথ চলতে চলতে দৃশ্যাবলী
অবলোকনের কাব্যময় ব্যর্থ চেষ্টার মতো।
গাছপাতা কাঁপছে। উড়াল দিচ্ছে খাদ্যসন্ধানী
পাখির ঝাঁক। পচা পানির গন্ধের মধ্যে
পাটচাষীদের পরিশ্রম। নারীদের নিয়ে
অশ্লীল কথাবার্তা -
আর অবিরাম বিয়ে বাড়ীর সানাই।
দেখো, ব্যাঙের ডাকের ওপর
একঘেয়ে বৃষ্টি
আর মানবগোষ্ঠীর অবলুপ্তির ভবিষ্যদ্বাণীর মতো
দিগন্তবিস্তৃত বিদ্যুতের চমক।

এর মধ্যে শিশুর কান্নাই আমাকে বিব্রত করে বেশী।
আমার দালানের নিচে বস্তির দর্জির
এক বছরের একটা শিশু যখন কাঁদে
আমি বিছানায় উঠে বসি।
চতুর্দিকের অন্ধকারকে মনে হয়
ভিয়েতনামের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের জলরাশি
যেখানে ঢেউয়ে ঢেউয়ে শিশুর ফোঁপানি,
বুদবুদ যেন ভয়ার্ত চীনা শিশুদের চোখ।

পথ চলতে চলতে দৃশ্যাবলী অবলোকনের
ব্যর্থ চেষ্টা কি জীবন ?
আমার সমস্ত অন্তরাত্মা
না না করে উঠলো।

গাছ পাতা কাঁপছে
উড়াল দিচ্ছে খাদ্যসন্ধানী পাখির ঝাঁক।

অনন্তকাল

অনন্তকালের মধ্যে তুমি কি করে থাকবে ?
যেখানে একটা নদী চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যায়,
একটা পাখি উড়ে যায় এমন অসীম শূন্যতায়
মনে হয় নিজের দৃষ্টিই ফিরে এলো
নিজের দিকে।

অনন্তকাল কি কারো চুম্বনের শব্দ ?
কোনো পরিচিত বৃক্ষের সবুজ কি অনন্তকাল ?
আমাদের বাড়ীর পুকুর পাড়ে
সজনে গাছে একটি পাখি।
আমার সমস্ত সচেতন কালের মধ্যে এর পালক খোঁচানো
আমি অবলোকন করি।

এ পাখিটি কার ? কালচক্রের উত্থানপতন
নদীর ভাঙন ও বাতাসের বেগ
আমাকে কতবার তোলপাড় করলো।
সামাজিক অর্থে, রাষ্ট্রীয় অর্থে
আমার কোনো বাড়ী অথবা পুকুরপাড় নেই। নষ্ট হয়ে গেছে।

তবুও একটি সজনেগাছ
আমার রক্তের মধ্যে। একটি পাখি
আমার ভ্রূর মধ্যে।

বন্দুক থেকে সরিয়ে হৃদয়

'সকল শিল্পের মাঝে আমাদের হাতে ধরা
অস্ত্রই প্রধান—'
এই বলে একদল শ্রেণীহিংসাপরায়ণ যুবা
আমার চলার পথ বেড় দিয়ে ধরেছিল
জানুয়ারী ১৯৪৬ সালে।

তবুও যেহেতু জানি চাঁদের পাথর আছে।
পৃথিবীর কয়েকটি শহরে এখনও,
এবং ঈশানব্যাপী আণবিক মেঘের কুণ্ডলে
ঢুকে যাচ্ছে বৈশাখের বাতাসের বেগ,
পোশাকের ধুলো ঝেড়ে
মানবিক বিশ্বাসের বলে
আমিও বন্দুক থেকে খানিকটা সরিয়ে হৃদয়
অনন্ত শূন্যের দিকে তর্জনী উঁচিয়ে বলে উঠি
ওখানে যে নিঃশ্রেণিক নীলিমা রয়েছে,
রয়েছে যে অগণন অঙ্কহীন গতির শৃঙ্খলা
এ কি কোনো মানুষের নিক্ষেপিত সীসার অধীন ?

আমার বাহাস শুনে যুবকেরা চতুর্দিকে বিদ্রূপ রটিয়ে
আমার পাছায় মেরে বন্দুকের বাট
উপত্যকা পার হয়ে চলে গেলো
পৃথিবীতে সামাজিক বন্টনের তীব্র এক
বিপ্লব ঘটাতে !

মানুষের আদি অভ্যাস

মানুষের আদি অভ্যাস হলো
সুদিনের জন্যে বসে থাকা।
বউয়ের ক্লান্ত চুড়িভরা হাত
হাঁড়িকুড়ি, ধূমায়িত ভাতের থালার পাশ দিয়ে
কখন বাড়ির চেনা বেড়ালের মত
সুদিন আসবে।

প্রাত্যহিক দিন যাপন
সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা
বুড়িগঙ্গার লঞ্চ আর
দ্রুতগামী রেলগাড়ী,
আমাদের জন্য প্রত্যেক দিন
সুদিনের বদলে নিয়ে আসে দুর্ঘটনা।
প্রত্যেকদিন অফিসে গিয়ে দেখি
সবচেয়ে সহৃদয় ব্যক্তি
যে হরিণের চামড়াটি পরতে ভালোবাসতেন
ভেতরের গরমে তাতে পচন ধরায়
এখন চিতার চক্করসহ তিনি হাঁসফাস করছেন।

তারপর জগতের সবচেয়ে নিরহংকার
একটি বিষয়ের দিকে আমার চোখ পড়লো
মোঘল যুগের একটি পুরনো মসজিদের
গগনভেদী মিনারের দিকে।
মিনারটি বিশাল আর আকাশ ফুঁড়ে
অসীমের দিকে উঠে গেছে।
প্রত্যেকদিন একটা ছোট্ট মানুষ
সিঁড়ি ভেঙে তার চূড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়
আর মানুষের সন্ততিদের
মঙ্গলের দিকে ডাকে।

ধমনীর ধ্বনি

আমাদের দিন শেষ হয়ে গেছে সই,
তোমার ছাপানো শাড়িতে নদীর নাম—
দেখে আর কেউ করবো না হৈচৈ,
বিস্মৃতি শেষ প্রেমিকের পরিণাম।

তোমার ছাপানো শাড়িতে মাছের ঝাঁক
স্মৃতির লবণ-সমুদ্রে তোলে মুখ,
মৌসুমী হাওয়া হয়ে আছে নির্বাক
যেন নাবিকের পেশল তপ্ত বুক।

ঝড়ের নক্সা ঈশানের কোণে শোনে
পাখিদের শেষ বিদায়ের ফিসফাস
যেন বা হৃদয় ধমনীর ধ্বনি গোণে
আর ভরে ওঠে আমাদেরি নিঃশ্বাস।

পেছনে দেখার প্রলোভনে প্রিয়তমা
আমরা যেন না হয়ে যাই প্রেতলোক,
একটি বিন্দু রেখো বাম চোখে জমা
কারো কবিতায় লেখা হোক এই শোক।

কালচক্রের কামনার কাছে দায়ী
জেনো গরীয়সী আমরা তো কেউ নই,
শেষ শয্যায় রয়েছি শয্যাশায়ী
আমাদের দিন শেষ হয়ে গেছে, সই।

সহনশীলতা

সব শূন্যতার মধ্যে ত্রস্ত দু'টি চোখ মেলে আমি
খুব নিচুস্বরে বলে উঠি,
আছে কিছু ? আমার ধারণাতীত কিছু ?
একটি পিঁপড়ে এসে কামড়ে দেয় হাত।
সহনশীলতায়
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিই তাকে
তার হিংস্র আচরণসহ ঘাসে।

পালায় সে ঘাস থেকে ঘাসে
তারপর পৃথিবীর নিরাপদ গর্তে ঢুকে যায়।

জীবন কি এ রকম ?
ভয় থেকে ভয়ঙ্কর ভাবে আমরা কি
কেবল ক্ষতির মধ্যে বাস করে
কামড়ে দিই অন্য কারো হাত ?
তারপর
থরথর কাঁপতে কাঁপতে চলে যাই
পৃথিবীর পেটের ভিতরে ?

আরোহণ

বৃষ্টিতে না হোক, তবু অন্য কিছু ঘটুক এখন
এমন রাত্রিতে এসে থেমে যাবে বন্ধ্যা বিস্ময় ?
হতাহত, অনাদর, অপমানে আরক্ত ভ্রমণ—
সানুদেশে একত্রিত, আরোহণও নিরাপদ নয়।

জ্যৈষ্ঠদের উৎসাহে নারীদের গোপন রোদনে
যদিও দাঁড়ালো উঠে যুবকেরা, শিশুর জনক
এমন কি কিশোরেরা কেঁপে ওঠে মোহিত বোধনে
বৃদ্ধেরা চিন্তিত, তবু পিছু ফেরা আরও ভয়ানক

আরও ভয়ংকর ওই পর্বতের তীর্যক চূড়াটা
কঠিন কষিত কান্তি, চিবুকটা পিচ্ছিল পাথর :
সহসা পেশল শব্দে যাত্রীদের প্রথম ঘোড়াটা
অতর্কিত লাফ দেয় বাতাসের বুকের ওপর।

অতল নৈঃশব্দে যেন উপচালো ঐক্যের আঁধার,
কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদে, পুরুষের প্রেয়সী না বোন
একদিন চূর্ণ হবে এই তিক্ত গোলকধাঁধার
এখন মশালে দাও একবিন্দু স্নেহের আগুন।

প্রতিতুলনা

আমার উদ্ভাবনার টেবিল জুড়ে তোমার আনাগোনা। আঙুল
নড়ছে আর ফুটো হয়ে যাচ্ছে উপমা। আমি পারি না
তবুও চায়ের কাপের সাথে, পারি না, তবুও ফুলদানীর কাছে
সিদ্ধ ডিমের সাথে তোমার মুখকে রাখলাম।

মাংস রান্না হচ্ছে, শিশুদের চোখে খুশী। বলবো না যে
গ্যাসের নীলাভ শিখার সাথে তোমাকে এক করা যেতো।
নদীর সাথে ? না। পাখি কিম্বা গোলাপও নয়।
তার চেয়ে এসো শোকেসে মদিনার কাসার কারুময়
পাত্রটিতে তোমার ভেজা মুখকে সাবধানে বসিয়ে দিই।

সমুদ্রের কথা আমি কেন ভাবতে যাবো। কেন বলবো যে
পুঞ্জীভূত মেঘমালা তোমাকে অতিক্রম করে গেলো।
কেন যাবো উত্তরের বাতাস দক্ষিণে ফিরিয়ে আনতে, না।
দেখো একটি বিমান মেঘের নির্লিপ্ততাকে ছাড়িয়ে
রানওয়ের দিকে কাত হয়েছে। তোমার বাঁকানো
গ্রীবাকে এইভাবে বর্ণনা করা যায়। যায় নাকি ?

একদিন দিল্লীর পুরানো কিল্লার মস্তক ছুঁয়ে
সূর্য ডুবে গেলে আমি খাঁটি বিদেশীর মত আকাশের
লাল আভাকে রক্তের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম।
এখন এই বৈদিক বর্ণচ্ছটাকে কি করে বলি যে
নারীর কণ্ঠদেশ হও ?

সব ইমারতের বাইরে

ইতিহাসের কয়েকটি ভারবাহী গর্দভ আমার ঈদের চাঁদ
আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। শিল্পকলা একাডেমীর
প্রশাসনিক গোল ইমারতের বাইরে
পৃথিবী থেকে অনেক দূরে যেখানে মেঘের গোল-গম্বুজ,
অকস্মাৎ সেখানে হযরত আলীর খঞ্জরের মত
ঝলসে উঠলো আমার ঈদের চাঁদ।
এক হাজার টাকার একটি চেকের চেয়েও হাল্কা
বাতাসে আমার চুল এলোমেলো হয়ে গেল।
আশেপাশে কোন মানুষজন না দেখে
আমি লাইটপোস্টের গায়ে হাত রাখতে রাখতে
বললাম, ঈদ মোবারক।

সাথে সাথে ঢাকা মহানগরী এক অপার্থিব জ্যোৎস্নায়
ঝলসে গিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেলে
পশ্চিম আকাশ থেকে মে'রাজের ঘোড়ার মত
নেমে এসে আমার সামনে নূহের নৌকার
মত দুলতে লাগলো—ঈদের চাঁদ। আর আমি
আমার সন্তানদের ঈদের পোশাক কিনতে
সন্দ্বীপের মাঝিদের মত মাস্তুল দুলিয়ে
নক্ষত্রের বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

প্রেম

একটি রাতের কাছে পরাভব মানো কি যুবতী ?
ভাবো চাঁদ নক্ষত্রের পাশেই রয়েছে। তারপর
নদী গেছে বাঁক ধরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে মৃদু মন্দগতি
বালিশ ভাসিয়ে দিয়ে নামে জল তোমার ওপর।

পুরুষ পাথর বটে কিন্তু যদি দশটি চুম্বনে
পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে ভাস্করের কান্না হয়ে যায়
শিলার কাঠিন্য নিয়ে তবে আর স্বপ্নে জাগরণে
বলো কোন নদী আর প্রস্তরের বদনাম গায়।
তার চেয়ে বেগবতী, শিলাশৈলে ঢোকো রন্ধ্র পথে
অন্তত তোমার ধারা যাতে কারো অন্তরে চোয়ায়
প্রেম, প্রেম—এই এক শব্দের শপথে
যেন সব গিরিচূড়া কম্পমান মস্তক নোয়ায়।

অন্ধলগ্ন

এইতো সময় এক, লোকে যাকে অন্ধকার বলে
কেউ বলে ঃ রাত্রি. দেবী, ঢুলে ঢুলে ঘুমের মহ্‌ল,
অহরহ দেখি তাকে ছোঁয় এসে আমার শরীর
নিজেই শুধোয় হেসে. 'কোন্‌ নামে ডাকবি রে তুই !'
আমিও নীরবে হাসি। চোখে ভরা ঘুমের তিমির
তবুও বলিনা কথা. আমি তাকে ডাকিনা কিছুই।
উত্তর জান্‌লা খোলা ঘরে আসে পাথরের হিম
চোখের পাতায় লাগে হিম হিম শিশিরের হাত
ভাবনার স্বেচ্ছাস্রোতে ভেঙে পড়ে ঘুমের আঘাত
মন বলে—'রাত নয়. নাম দাও নেশার আফিম।'

মানুষের স্মৃতিস্তম্ভে

মাঝে মাঝে জ্বলে উঠি শীতরাতে ভৌতিক আগুন
কাঁথালেপ ফেলে দিয়ে, সরিয়ে চায়ের কাপ নারকী কলম
চেয়ে থাকি দূরে কালো রহস্যময় রাত্রির ভেতর।
চেতনা জিজ্ঞাসা কিম্বা ধুকপুকে হৃদয়, যাহোক
আমার তালিকা থেকে অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে, এই
এনেছে শিশিরসিক্ত পৌষের নিঃস্ব কালোরাত।
সঙ্গিনীরা নেই কেউ। আছে কিছু বঞ্চনার স্মৃতি
যা দেয়ালে পরিচিত শিল্পীদের অযাচিত উপহার হয়ে
শত বাসাবদলেও থেকে যায়। গান হয়ে ওঠে
আমার আত্মার সাথে, একজন লক্ষ্যভ্রষ্ট কবির ভেতরে।

এই কি বার্ধক্য তবে ? হাটু ছুঁয়ে কেঁদে ফেলা
আমের বুকের মত মাংসের সোনালি কুঞ্চন ভেঙে
নেমে আসা গেটেবাতে কম্বল জড়িয়ে
কেবলি মালিশ আর গরমপানির জন্য হাঁকডাক ?

ঐতো নক্ষত্র সেই জন্মের রাতের বৃহস্পতি
পরীর চোখের মত ইশারায় আমাকে জানায়
শেষ নেই, শেষ নেই ফিরে এসো সোনালি যুবক
মাংসের পরত দিয়ে তোমাকে সাজানো হবে ফের ;
স্নায়ুর ভেতরে হবে রক্তরস, স্বাদে-গন্ধে সিক্ত হবে সব।
মাড়ির ফোকড় ভেঙে মুক্তোর বাঁধনে
থাকবে দাঁতের পংক্তি। বলো কাকে চুমুর জগতে
ফুলের নামের মত নাম ধরে ডাক দিতে চাও !

আমি আমিনাকে, পৃথিবীর সর্বশেষ বিনম্র নারীকে,
যে তার কলস ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে হাতের কাঁকন
গোয়ালে আগুন দিয়ে শিশু ও পশুর পাল
ঠেলে দিয়ে অদৃষ্টের হাতে
নদীর উদ্দেশে গিয়ে হয়ে গেলো নদী,
তার নাম পৃথিবীর সমস্ত ভাষায়
মানবজাতির সব অপরূপ স্তম্ভের ওপরে
উপমাবিহীনভাবে লিখে রেখে চলে যেতে চাই।

প্রেয়সী তোমাকে

প্রেয়সী তোমাকে ছাড়া কবিতার আর মৌল বিষয় খুঁজিনা।
একদা প্রকৃতি ছিলো, ছিলো দেশ, সময় সুদিন
জয়-পরাজয়ে ক্ষুব্ধ আত্মার দুলুনি ছিলো বুকের ভেতরে
অবিশ্বাসী লাল চোখে নুনের ছিটার মতো মনে হতো যাকে
আজ সেই তুমি ছাড়া সৌন্দর্যের অন্যকোনো তুলনা কি আছে ?
তুমিতো নক্ষত্র নও, নও পাখি কিম্বা কোনো পুষ্পের স্তবক
নদী আর প্রান্তরের হ্রদের উপমা দিয়ে যারা
তোমাকে ভোলাতে চায় তারা জেনো তোমারি সন্তান।
আর তো প্রেমিক আমি, চাই চির বন্ধ্যা হয়ে থাকো
অস্পৃষ্টা সুদূর এক নক্সাদার বিছানায় যাকে
ভেবেছি পাতবো শয্যা ঢেলে দাও সেখানে আতর
তোমার তুলনা নেই—এই হোক কবিদের সর্বশেষ কথা
মানুষের রক্ত, বিষ্ঠা অতিরিক্ত ঘামে ও বমনে
হায় খোদা, শেষমেষ তোমার এ শুদ্ধতম শিল্প ভেসে যায়।

কবিরা, বাঁচাও

কবিরা বাঁচাও, দেখো অস্ত যায় মানুষের মাতা ও প্রেয়সী
আর অবশিষ্ট নেই, দেখা যায় গ্রাসের ভেতরে
কালিমার ঢেউয়ে ভাসা লুপ্তপ্রায় কেশরাশি কার ?
একটু আগেও ছিলো শাড়িখানি দেহলিপ্ত, নেই।
কালের জোয়ার এসে কলঙ্কের তরঙ্গে ডোবায়
উপমার শেষ চিহ্ন সেই গ্রীবা—একদা যে হাঁসের গলাকে
পরম বিদ্রূপ ভরে কবিতায় দেয়নি প্রশ্রয়,
ওহো ডুবে যায় আজ সৌন্দর্যের সমস্ত গরিমা।
প্রেমে অবিশ্বাসী যদি এসো তবে শোধ করে দিই
জন্মের জটিল তত্ত্ব যাকে লোকে মাতৃঋণ বলে,
অন্তত মায়ের বুক আমাদের কাব্যে লেখা হোক—
বলা হোক, কুসুমের কুটিল কাঁটায় পরাজয়
যদিও মেনেছি সত্য তবু এই গৌরব ভুলিনি
আমারও উদ্ভব মানি প্রেমময়ী নারীরই উদরে।

কবির বিষয়

আমার বিষয় নেই যাকে বলে কবির বিষয়
হেঁসেলের খোঁয়া ছাড়া, শিশুদের কলবর ছাড়া
এই শীতরাতের আকাশ শুধু চেয়ে আছে
অযুত তারার চোখ মেলে।

আমার উদ্ভব নিয়ে ভাবি, কিভাবে যে আমার উদ্ভব ?
যে আমি জানিনা কবে কি কারণে অস্তিত্বে এসেছি।
কি সার্থকতায় হাসি, লিখি অর্থহীন অনাবৃত শব্দের চাতুরী
বলি, প্রেম, প্রেম, প্রেম—যেন সত্যি কিছু একটা আছে
আছে বিশ্বাসের মত কিছু
যাতে ছোঁয়ামাত্র জেগে ওঠে স্মৃতি ;

স্মৃতি ?

দূরবর্তী কোনো গ্রাম নদীর পাড়ের সেই বাড়ী
লোকজন নেই কেউ, বিধবা ফুপুর সাথে একখাটে
একটি লেপের নীচে শোয়া
অসহায় দু'টি প্রাণী ক্ষুধা ও অজন্মার ভয়ে ভীতত্রস্ত
গল্পহীন চিরদিন।

এর মাঝেই জেনে যাওয়া শরীরের স্বাভাবিক রীতি
স্তনের গরমে সাবধান,
চুলের সুবাসে সচকিত।
পানখাওয়া ফাঁটা ঠোঁটে উষ্ণ চুম্বন পেয়ে ভাবা
খয়েরের গন্ধে গরীয়ান
আমিই পুরুষ।

আমিই পুরুষ বটে।

পুরুষ, চালায় হাল আল ভেঙে ঠেলে যায় ফাল
মাটিকে মাখন করে গোঁজে বীজ, গোঁজে জন্মকণা
নারীর কোষের মাঝে রাখে কীট
কালোত্তীর্ণ প্রাণের কীটাণু।

আমার বিষয় তাই, যা গরিব চাষীর বিষয়
চাষীর বিষয় বৃষ্টি ফলবান মাটি আর
কালচে সবুজে ভরা খানাখন্দহীন
সীমাহীন মাঠ।
চাষীর বিষয় নারী
উঠোনে ধানের কাছে নুয়ে থাকা
পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী।

আর স্বপ্ন সন্তানের
পুত্র চাই, অসংখ্য উলঙ্গ পুত্র
পিঁপড়েসারির মত খেয়ে আসা অগণন
আগামী কিষাণ।

যন্ত্রণা

অন্ধকারে ঘৃতদীপ। হাতে এক সপ্তসুরী বীণা
সে এক ধ্যানীর মূর্তি, আমি তাকে কখনো বুঝিনা
বাজায় ব্যথার সুর।
ঝুর ঝুর আঙুলের টানে
হৃদয়ের তন্ত্রী কাঁপে। বুঝিনা এ যন্ত্রণার মানে
হানে সে আমাকে কেনো ?
শুধু তার জিজ্ঞাসার নখ
আমাকেই ছিন্ন করে, টেনে দেয় ব্যর্থতার ছক
আমার চৌদিক জুড়ে।
আর সেই ব্যথার বিলাসী
আমার অলক্ষ্যে থেকে হেসে ওঠে অলৌকিক হাসি।
এদিকে অসহ্য ভয়ে আমি কাঁপি ভয়ের শশক।

স্তব্ধতা

কাল রাত বৃষ্টিকে মনে হচ্ছিল নারীর কান্নার মত,
অথচ তোমার রোদন কি করে পানিঝরার শব্দের মত হবে ?
তোমার তো জলের কোনো স্বভাবই নেই। বরং
পাথরের সাথে খানিকটা মেলানো যায়। সে যখন
আয়তনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে থাকে। এই স্তব্ধতা
নিয়ে এলে তুমি আমাদের ঘরে।

থাকবে বলে চলে এলে যখন
তোমার চিবুক ছিলো পাথরের ভাঙা টুকরোর মত।
আর কাবিন সই করেছিলে গাঢ় সবুজ কালিতে।
লালপুর থেকে ভৈরবের ব্রীজকে যেমন দেখায়
তোমার নামের বানানও বুঝি তেমনি।
অক্ষরগুলো যেন ইস্পাতের কড়িবর্গা
নীচে স্রোত
কিন্তু কাঠামোতে পানির ছিটা লাগে না

বৃষ্টিকে তবুও তোমার কান্নার মত মনে হলো কালরাত।

মাংসের ফল

সৌভাগ্যবশত মানি তুমি আছো তেমনি অজর,
হাসি আর মস্করায় কেটে গেল আমাদের দিন ;
কোনটা যে শীত আর কোন পাখি বসন্তকালীন
তোমার কদম ডালে জপেছিলো কালের প্রহর।
কালের ছোবল আর লবণাক্ত চুমোয় বিলীন
হয়ে আছি দুইজনে, যেন দু'টি তোতার অধর
খড়কুটো টানলো না, জানলো না ঘরের খবর
মানলো না প্রেম হবে মেঘ-রোদ-বৃষ্টির অধীন।

আমাদের পরিহাসে প্রকৃতির ঘোমটা খুলে যায়,
যা কিছু শিথিল দ্যাখো, তাতেই কি তৃপ্তি লেগে আছে ?
ফুল ফল লতা পাতা অরণ্যের আনাচে কানাচে
যেন এক অনিবার্য বিদায়ের সংগীত শোনায়।
ঝরে যেতে যেতে দেখি আমাদের শোনিতের গাছে,
দু'য়েকটি মাংসের ফল ঝুলে আছে উন্মুখ শোভায়।

সজলমুখী

নদীর কথা বলা মানেই, বুকে
আস্তে নড়ে জলের ঢেউ ঘোলা,
তোমার নাম ভাবলে ভাসে চোখে
বালিশে লাল গোলাপফুল তোলা
হে প্রেম, তুমি শব্দ করে ওঠো
যেমন ওঠে আকাশে ধ্রুবতারা,
কালের হাত শিথিল করো মুঠো
সজলমুখী এসেছে একহারা।

এসেছে সেই যুবতী যার হাতে
চিরকালের কবির দেওয়া বালা,
নকশাকাটা তারায় ভরা রাতে
রুপোলি এক থালা।

অলীক অসতী মায়া

কেন যে ফিরিয়ে রেখেছো নিরুত্তর
উপমাবিহীন ও দুটি চোখের তারা ?
ঝড়ের পরের পাতাদের থর থর
তোমাকে কি তবে করেছে চেতনহারা।
অন্তত বলো চেয়ে আছো কার পানে ?
কোনো প্রাণীরই তো থাকে না সে ইন্দ্রিয়
যার অভিঘাতে মৃত্যুর মাঝখানে
বলে, এই কালো যুবতীই তার প্রিয়।

আসক্তিহীন দৃষ্টির কামনায়
পৃথিবীর ছবি আসলে প্রতিচ্ছায়া,
পারদবিহীন ভাঙাচোরা আয়নায়
তুমি মায়া, তুমি অলীক অসতী মায়া ;
তাহলে প্রেয়সী প্রসারিত করে ভুরু
একবার দেখো আমারি চোখের মণি,
শুরু হবে বুকে অনার্য দুরুদুরু
দেবে যে নবা পেয়েছো সোনার খনি।

নীল মসজিদের ইমাম

আজ হৃদয় অকস্মাৎ প্রার্থনায় সুস্থির হাতের মত
উঁচু হয়ে উঠেছে।
এসো বসে পড়ি হাঁটু মুড়ে। আজ রাতে পৃথিবী
নুয়ে পড়েছে নিজের মেরুতে কাত হয়ে। ঝড়ো বাতাসের
ঝাপটা থেকে তোমার উড়ন্ত চুলের গোছাকে
ফিরিয়ে আনো মুঠোর মধ্যে। বেণীতে বাঁধো
অবাধ্য অলকদাম।
কেন জিনেরা তোমার কেশ নিয়ে খেলা করবে ?
আজ সমুদ্রের দিকে তাকাও। দ্যাখো জোয়ারে ফুলে উঠেছে
দরিয়া। চাঁদের গুঁড়িয়ে যাওয়া প্রতিবিম্বকে নিয়ে
টাকার মতো লোফালুফি করছে উন্মত্ত তরঙ্গের মাতাল হাত।
তোমার আব্রু ঠিক করে নাও। এইতো ছতর ঢাকার সময়।
কোথায় হারিয়ে এসোছো তোমার বুকের
সেফর্টিপিন ?
আজ ইবলিসকে তোমার ইজ্জত শুঁকতে দিও না।
পর্বতের দোহাই মেয়ে। কসম ঐ চিম্বুক পাহাড়ের।
দ্যাখো কি বিনীত এই ঋজুতে। যেনো
শৃঙ্গগুলো এখনই সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। কিম্বা
ছড়িয়ে যাবে উরুর মতো। আমার আলিঙ্গনে
যেমন তুমি কপাটের মতো খুলে দাও।
শয়তানের ফুৎকারে উন্মুক্ত না হোক তোমার দরোজা
তোমার খিল।

ঢাকা তোমার মুখ। কারণ
মগরের নকীবেরা এখন দাজ্জালের আগমনশিঙায়
ফুঁক দিচ্ছে।
ঢাকো তোমার বুক। কারণ
সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ে আমরা
হকের তালিকায় লিপিবদ্ধ।
চলো অপেক্ষা করি সেই ইমামের
যিনি নীল মসজিদের মিনার থেকে নেমে আসবেন
মেশকের সুরভি ছড়িয়ে পড়বে
পৃথিবীর দুঃসহ বস্তিতে।

বখতিয়ারের ঘোড়া

বখতিয়ারের ঘোড়া

মাঝে মাঝে হৃদয় যুদ্ধের জন্য হাহাকার করে ওঠে
মনে হয় রক্তই সমাধান, বারুদই অন্তিম তৃপ্তি ;
আমি তখন স্বপ্নের ভেতর জেহাদ, জেহাদ বলে জেগে উঠি।
জেগেই দেখি কৈশোর আমাকে ঘিরে ধরেছে।
যেন বালিশে মাথা রাখতে চায়না এ বালক,
যেন ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে মশারি,
মাতৃস্তনের পাশে দু'চোখ কচলে দাঁড়াবে এখুনি ;
বাইরে তার ঘোড়া অস্থির, বাতাসে কেশর কাঁপছে।
আর সময়ের গতির ওপর লাফিয়ে উঠেছে সে।

না, এখনও সে শিশু। মা তাকে ছেলে ভোলানো ছড়া শোনায়।
বলে, বালিশে মাথা রাখো তো বেটা। শোনো
বখ্‌তিয়ারের ঘোড়া আসছে।
আসছে আমাদের সতেরো সোয়ারি
হাতে নাংগা তলোয়ার।

মায়ের ছড়াগানে কৌতূহলী কানপাতে বালিশে
নিজের দিলের শব্দ বালিশের সিনার ভিতর।
সে ভাবে সে শুনতে পাচ্ছে ঘোড়দৌড়। বলে, কে মা বখ্‌তিয়ার ?
আমি বখ্‌তিয়ারের ঘোড়া দেখবো !

মা পাখা ঘোরাতে ঘোরাতে হাসেন,
আল্লার সেপাই তিনি, দুঃখীদের রাজা।
যেখানে আজান দিতে ভয় পান মোমেনেরা,
আর মানুষ করে মানুষের পূজা,
সেখানেই আসেন তিনি। খিল্‌জীদের শাদা ঘোড়ার সোয়ারি।
দ্যাখো দ্যাখো জালিম পালায় খিড়কি দিয়ে
দ্যাখো, দ্যাখো।

মায়ের কেচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়ে বালক
তুলোর ভেতর অশ্বখুরের শব্দে স্বপ্ন তার
নিশেন ওড়ায়।

কোথায় সে বালক ?

আজ আবার হৃদয়ে কেবল যুদ্ধের দামামা
মনে হয় রক্তেই ফয়সালা।
বারুদই বিচারক। আর
স্বপ্নের ভেতর জেহাদ জেহাদ বলে জেগে ওঠা।

অতিরিক্ত চোখ দু'টি

হে ক্ষীণাংগী অধ্যাপিকা, কাল জীর্ণ চিঠির ভিতরে
অকস্মাৎ পেয়ে গেছি তোমার লুকানো চোখ দু'টি
শুকানো ফুলের সাথে পড়েছিলো, বেশ বড়োসড়ো
কাজলের কালিটানা চেনাজানা দারুণ সজল।
হাতে ছুঁয়ে দেখলাম, বাষ্পে ভিজে গিয়েছে আঙুল।

এ ঘরেও চোখ আছে। কি বিপদ অতিরিক্ত আরও দু'টি নিয়ে
এখন কোথায় রাখি ? হা হা করে উঠেছে সংসার
বালিশে রেখোনা কিন্তু সাবধান, বিছানা ভিজাবে ;
পারো যদি ফেলে দাও, কে আর তাকিয়ে আছে বলো ?

বড়ো বেশী কাঁদো বলে এ বাড়িতে রাখাও মুস্কিল।

আহা যদি বলে দিতে চোখজোড়া পাঠিয়ে এখানে
যেখানে রয়েছো আজ সেখানে কি হাল্‌কা বোধ হয় ?

বামা

এ কোন্ সাহসে নারী
যাতনার এই সংসার দাও পাড়ি ?
আকাশ ঝরায় বিজ্‌লির রেখা
বাতাসে তুহিন নামে
তুমি স্থির, তুমি উদ্যত থাকো বামে
আল্লার তরবারি।

লেখার সময়

অকস্মাৎ কেঁপে উঠি, অকস্মাৎ মনে হয়
বাতি নেই। শহরের সব পথ নিভে গেছে
বন্দরের সমস্ত বিজুলী
মোহ্যমান।
দিশাহীন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জাহাজ
না পেয়ে জেটির দেখা মধ্য সমুদ্রে ফেলে স্থিতির নোঙর।

আস্তে আস্তে ডুবে যাই।
জল ঢোকে দুর্বার গতিতে
শরীরে নুনের গন্ধ টের পাই।
শাদা এক পূর্ণ পৃষ্ঠা নিয়ে খেলা করে
পোষা আর পরিতৃপ্ত দুইটি হাঙর
আমি আর আমার চেতনা।

তারপর
শাদা সে কাগজটিকে ভাগ করে খেয়ে ফেলে তারা।

মাছের নিশ্বাস আর বুদ বুদের ভেতর তখন
ডালপালা মেলে দেয়
আমার শরীর।

তোমার আগুন

তোমার দাহ নিয়েছিলাম
তোমার থেকে নিয়ে,
নিজেরই ঘর জ্বালিয়ে দিলাম
কুলে আগুন দিয়ে।

সবাই হাসে মীর বাড়ীতে
মেজো মীরের নাতি,
কে জানে কার কুদরতিতে
বাতাসে দেয় বাতি।

হায়রে দ্যাখো, কেউ জানে না
ভালোবাসার ভুলে
ঐ বাড়ির ঐ মধ্য ভিটেয়
আতশীফুল দোলে।

ঘর পোড়ালাম দোর পোড়ালাম
কুলে দিলাম কালি,
কত ইতর লোক হেসেছে
বাজিয়ে হাততালি।

কোন্ নগরে ঘর বেঁধেছো
কোন্ সায়রের পারে ?
তোমার আগুন বইতে নারি
শরীরে, সংসারে ॥

চেতনাবিন্দু

ফিরতে হবে জানি আমি।
কিন্তু কবে, সে ফেরার দিনক্ষণ কবে
জানতে বড়ো সাধ জাগে
তখন কি যাকে বলে মেধা তার কিছু অংশ থাকবে শরীরে
ডাকবে কি নাম ধরে কেউ ? বলবে কি
আমাদের মামুদটা দ্যাখো
কি দারুণ ভাগ্যবান
তেল ফুরুবার আগে গিয়েছে ফুরিয়ে।

দেবো কি উড়াল গাঢ় অন্ধকারে ক্ষীণ এক অনুভূতি আমি ?
'আমি' এই শব্দ শুধু। আমি
এক খাঁচাহীন দেহের কাঠামো থেকে দূরে
একটি চেতনাবিন্দু ঈথারের ভিতরে ঈথারে।

কে তুমি কাঁদছো প্রিয়তমা ?
তুমি কি আমার বিচ্ছেদে ফাটালে চোখ
নাকি কালো পার্থিব কামনা
লুটায় এ পৃথিবীর ঘরের চৌকাঠে। লুটায় আয়ুর সুতো
কড়ে আঙুলের কাছে বাঁধা আছে বলে।
আছে ক্ষিধা
আছে এখনও নুনের গন্ধ
এখনও মাছের গন্ধ, আর
হালাল মাংসের মাঝে তৃপ্তির গন্ধ আছে তার।

যেন আমি প্রজ্ঞানের জাল ছিঁড়ে পার হয়ে আয়ুর বেদনা
হয়ে যাই নিঃশ্বাসের শেষ হাওয়া
যে বায়ু ফেরেনা নাকে আর কোনো মামুদের হৃদপিণ্ড দোলাতে।

অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকার গান

সিদোনের পথে ফুটেছে রক্তজবা
কমলার বন হলুদ হলো কি পেকে ?
বলেছিলে তুমি আসবে আঁধার হলে
থামলে দারুণ বারুদের গর্জন ;
কামানের কালো ধোঁয়ার আড়াল দিয়ে
কথা ছিলো ঠিক লাফিয়ে পড়বে বুকে
যে বুকে সদাই ধরা থাকে রাইফেল
অস্ত্রের দাগ চুমোয় ভরিয়ে দিতে।

শিবিরে আমার পনিরের টিন খালি
মধুর বোতল উড়ে গেছে গুলি লেগে
আছে পানি আর আছে কিছু কিসমিস
তাই দেবো, যদি ফিরে সে বীরের বেশে,
বিজয়ী যদি সে ফিরে আসে এই বুকে
কাফেলার লাল প্রথম উটের মত
গলায় বাজছে বিজয়ীর দুন্দুভি
আমি হবো তার তৃষ্ণার উপশম।

মুখ তার আল-আক্সার গম্বুজ,
যেন সিরিয়ার উদ্যান বুকখানি,
শিটিম কাঠের দণ্ডের মত বাহু
উরুযুগ, বুঝি ঘুমিয়েছে বৈরুত।
অক্ষত যদি ফিরে সে আমার কাছে
সিজদায় আমি কাটাবো আধেক রাত
ওগো মরণের মালিক রহম করো,
বাকি আঁধিরাত পোহাবো সোহাগ করে।

সনেট—১

হাতীর পালের মত মেঘের গম্বুজ নিয়ে কাঁধে
নগ্ন হয়ে নেমে আসে আষাঢ়স্য প্রথম দিবস
বাংলার আকাশ জুড়ে মেঘ আর রোদের বিবাদে
বাতাসও বুঝতে নারে, এ কামিনী কবে কার বশ ;
যা ছিলো সজীব দৃঢ় এমন কি কেয়ার কাঁটাও
বর্ষণের ব্যাভিচারে দিগ্বিজয়ী জলের মর্দনে
সেখানে ফোটায় ফুল আর বলে, খোলস ফাটাও
কিম্বা যদি দ্যাখো মুখ, দ্যাখো চেয়ে জলের দর্পণে।
তুমিই দাঁড়িয়ে আছো, আর সবি নত ও নরম
বৃষ্টির বিধানে সিক্ত এমনকি তোমারও কামিজ
প্রকৃতি গুছিয়ে দেয় সবুজের সহজ শরম
আমার আধারে কাঁপে একবিন্দু জীবনের বীজ
দক্ষিণে দরিয়া সাক্ষি আর উচেচ সাক্ষি হিমালয়
তোমার উচিত শুধু খুলে দেয়া, আর কিছু নয়।

সনেট—২

কার অপেক্ষায় যেন মধ্যরাতে খুলে দিলে খিল
কেউনা, বাতাস খেলে ভরাবর্ষা ঋতুর অভয়
যতদূর বোঝা যায় শূন্যতায় নিদ্রিত নিখিল
তোমার কর্তব্য শুধু খুলে দেয়া, আর কিছু নয়।
ঝরে বৃষ্টি অবিরাম গুঁড়ি গুঁড়ি সলজ্জ মাটিতে
মাথা তুলে তারা, যারা নির্বাচিত আসন্ন, প্রথম
সংগুপ্ত ফলের মধ্যে কিম্বা কোনো বিষণ্ণ আঁটিতে
যে ছিলো বাতাসহীন আজ তারি অংকুরোদ্গম।
আমরা কি বীজ তবে ? নাকি কারো খোলস, চাদর
কিম্বা দেহে আবর্তিত একবিন্দু বেগবান বারি ?
এখন বৃষ্টির শব্দে জল করে জলকে আদর
রাজি কি নারাজ তুমি নিমিত্তের ভাগী হই তারই।
ঋতুরও অসাধ্য যা সেই রন্ধ্রে জানায় প্রণয়
তোমার কর্তব্য শুধু খুলে দেয়া, আর কিছু নয়।

সনেট—৩

দীর্ঘদিন ধরে রেখে যে সত্য বলিনি কোনোদিন
আজ বড়ো সাধ জাগে বলি তারে, বলি, ওগো ধনি
যে কথা পাঁজর ভাঙে ছিঁড়ে ফ্যালে স্নায়ুর বাঁধুনি,
সে ভারেই ন্যুব্জ আমি, হে বঞ্চিতা তুমিই স্বাধীন।

তোমাকে ঠকাতে গিয়ে নিজেকে করেছি ঘরছাড়া
কত উপত্যকা ঘুরে পার হয়ে কত মরুদ্যান
কত যে তরংগে ভেসে শুনে কত বেদেনীর গান
আজ মানি, প্রাণ চায়, ভিক্ষা দাও তোমার পাহারা।

তুমি তো ঘুমাও নারী নিরাশার নিঃস্বপ্ন বালিশে
যখন আমার চোখ সপ্তর্ষির মতন সজাগ,
পূর্ণিমার চাঁদে দেখি এ হাতের চাবুকের দাগ,

ভ্রমরের গুঞ্জনে রাতজাগা পাখিদের শিসে
যখন গোলাপ ফাটে, ফেঁপে ওঠে ফুলের পরাগ
দণ্ডিত পোহাই রাত ঝিঁঝিদের অসহ্য নালিশে।

সনেট—৪

সময়ের শেওলায় ঢেকে গেছে আমার ললাট
তবু কিছু চিহ্ন পাবে যে প্রতীক আজও চেনা যায়
এই সে পাষাণ যার ভেঙে যাওয়া মুখের রেখায়
এখনও গোপন আছে এক মহাকাব্যের মলাট।

আছে সে নিমক সূক্ষ্ম যা একদা তোমার অধর
গভীর আবেগে মেখে দিয়েছিলো আমার অধরে,
যে নুন ব্যাকুলভাবে মিশে আছে বাসনার স্তরে
এখন সেখানে শুধু লবণাক্ত দুইটি অক্ষর।

'প্রেম' এই বাক্যটিতে দ্যাখো কত ব্রহ্মাস্ত্রের ক্ষত
অনাদরে বসে যাওয়া তবু শোনো কেমন সরব,
পাথরে জাগিয়ে তোলে পরাজিত কবিদের স্তব
এখন সেখানে শুধু লবণাক্ত দুইটি অক্ষর।

যে কম্পনে মনে হবে পৃথিবীর সমস্ত আহত
পাখিদের কলগানে অকস্মাৎ জেগেছে উৎসব,
আমাদেরও ভবিতব্য মৃত সব কোকিলেরই মত।

সিকারীর শেষ দিন

......বেচারী একাকী চলে, একাকী মারা যাবে,
আবার একাই উত্থিত হবে।
—হাদিস

—এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে, হে আবু জর, রবজার নির্জন প্রান্তরে তুমি কি তোমার যাত্রার দিন বেছে নিলে প্রিয়তম ? আরার ফুলের পাপড়ি থেকে উড়ে গেছে নীল মাছির ঝাঁক। হাজীদের কাতর কলরব ধুলো উড়িয়ে দিগন্তে গেছে মিলিয়ে। আমিরুল মোমেনিনের কাফেলা নিশ্চয়ই এখন পবিত্র নগরীর দ্বার প্রান্তে। দামেশকের আমিরেরা এখন মক্কার ধনীদের সাথে কোলাকুলি করছে। আর তুমি, হে গিফারীদের পুত্র, রওনা হয়েছো তোমার সেই ধ্রুব নৈশব্দ্যের দেশে। আমি অবলা নারী, এক বিশাল পুরুষের কবর কিভাবে খুঁড়বো এই পাথুরে মাটিতে প্রিয়তম ? রসুলের সাথী হে আবু জর, তুমি কি একখণ্ড কাফন সঞ্চয়েরও বিরোধী ছিলে ? বাহার ফুলের কেশর ছেড়ে নজদের লোভী মৌমাছিরাও যখন বেদুইনের মত পালিয়েছে, তখন কে আমাকে দেবে মৃত মোমিনের জন্যে সেলাইবিহীন শাদা চাদর ?

—কে তোমাকে কাঁদিয়েছে কালো মেয়ে ? মৃত্যু ? পাগল, প্রাণধারণের পরিসীমা সম্বন্ধে তুমি কি শোনোনি মোহাম্মদের, যাঁর ওপর আল্লাহ্‌র অব্যাহত করুণা সেই পয়গম্বরের বাণী ? মৃত্যুর যাতনা দুঃসহ বটে, নারী। তবু শোনো আমার অমোঘ নিয়তি, প্রেয়সী। একদল বন্ধু আমরা, নবীকে ঘিরে বসেছিলাম একবার এক উপত্যকায়। অকস্মাৎ তাঁর পবিত্র ঠোঁট নড়ে উঠলো। তিনি উচ্চারণ করলেন ভবিষ্যৎ। বললেন, 'তোমাদের একজন কেউ জনহীন প্রান্তরে প্রাণ দেবে।'
আমি সেই পবিত্র উচ্চারণ আবার শুনতে পাচ্ছি, প্রিয়তমা।—''আর মুসলমানদের একটি দল হাজির হবে তাঁর জানাজায়।''
হে শ্যামাংগী সংগিনী আমার, একদা সেই পুণ্যস্থানে যাঁরা ছিলো আমার সাথী, দেখো তাদের সকলেরই মৃত্যু এসেছিলো নগরসমূহে, জনবেষ্টিত উপত্যকায়। শুধু আমি। শুধু আমিই সেই অমোঘ বাণীর সবিশেষ বর্ষণস্থল। আর কেউ নেই। কেন কাঁদবে তবে এই নির্জন কান্তারে। এখন কাতায়াশরফের যাযাবর ঘুঘুরা উড়ে

যাচ্ছে মদিনার মেঘের ছায়ায় পবিত্র কাবার আকাশে চক্কর দিতে। রবজার কোনো বৃক্ষ ছায়ায়, উট বা ছাগলের পিঠে এখন বসার সময় নেই তাদের। আমার সময় স্থিরীকৃত, প্রিয়তমা। জাতে এরেকের উল্টোদিকে মক্কার পথের ওপর নিশ্চয়ই এখন ধূলোর মেঘ। আমার জানাজার সাথীরা আসছে। যাও, ডেকে নিয়ে এসো তাদের প্রিয়তমা।

—আমি কৃষ্ণা ছায়া সঙ্গিনী তোমার, হে গিফারী। সেই কালো খাপ, যাতে প্রবিষ্ট ছিলে ঈমানের তীক্ষ্ণ তরবারি তুমি। সোনা ও চাঁদির পাহাড় নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে তুমি ছিলে পবিত্র কোরানের তুফান। আমি বাতাসের বেগ নিয়ে তোমার ঝড়কে চুম্বন করি, প্রিয়তম। আমি তোমার জানাজার সুন্দর সাথীদের ডেকে আনবো।

—উমাইয়া রাজারা আমাকে মৃত্যুর ভয়ে টলাতে চাইতো। হে আমার কালো ছায়া-সবুজ সুর্মাদানী, পৃথিবীর পিঠের চেয়ে এর উদর আমার চিরকাল কাম্য ছিলো, তোমার কসম।

রাত্রির গান

রাত্রির গান গেয়েছিলো এক নারী
আমার সাথেও ছিলো কিছু পরিচয়,
একহাতে রেখে আগুনের মত শাড়ি
বলেছিলো, ভীতু তোমারও কি আছে ভয় ?
কাজলের ঘরে ঢুকেছিলে তুমি বোকা,
কালির চিহ্ন ললাটে ধরেছো স্থায়ী,
কলঙ্কী চাঁদ শুনেছিলো সেই টোকা
তুমি ফিরে গেছো বাতাসকে করে দায়ী ?

সেই নিশিথেরই নদী এক খাপ খোলা
ঢেউ তুলে তার বিবেকের ঘোলা জলে,
প্রমাণ রেখেছে তরংগে ফুল তোলা
যেন ব্যাভিচার বাতাসে না যায় গলে :
কবির পোশাকে ঢাকবে কি অপরাধ ?
ঢাকবে কি প্রেম, ঢাকবে কি পরাজয় ?
সেই কালোজল-তটিনীর প্রতিবাদ—
বলো, 'ভালোবাসি' —তোমার কিসের ভয় ?

ওগো নদী শোনো, ওগো খণ্ডিতা স্মৃতি,
তোলোনা অতীত, এনোনা জলের পীড়া
একটি কবিতা শিরোনামে, বিস্মৃতি
লিখেছি বলেই বিমুখ কি সাক্ষিরা ?
ভালোবাসা বলো কি চাও প্রেমের দাম ?
রতিতে মেটেনি ? রক্তে মেটাও সাধ,
প্রথম পাতায় যেখানে তোমার নাম
কেটে সেখানেই লিখে দাও প্রতিবাদ।

কালো চোখের কাঁদা

ভোরের সমুদ্রের মত মনে হয় তোমাকে কখনো,
কখনোবা সন্ধ্যার নদী, আবছা ছায়ার নীচে
দূর গ্রামে সূর্য ডুবে যায়
পড়ন্ত আলোর মধ্যে প্রকৃতির রহস্যে জড়ানো
আমি দেখি সেই মুখ নত আরও—নত প্রার্থনায়।

ঠাণ্ডা জায়নামাজের বুটিতোলা পবিত্র নকশায়
একটি আরশোলা হাঁটে। এ কার আত্মা, কার প্রাণ ?
নাকি কোনো মুরতাদ জিন লাঞ্ছনার খাদ্য খুটে খায়
আর শুকনো কাপড়ে দেখে অগ্নিশিখা, নিজেরই সমান।

তোমার সিজদা দেখে এ ঘরের পায়রা ডেকে ওঠে
গম্বুজের ভিতরে যেন দম পায় সুপ্ত এক দরবেশের ছাতি,
কি শীতল শ্বাস পড়ে। শান্ত শামাদানের সম্পুটে
বাতাসের ফুঁয়ে যেন নিভে গেল ফজরের মগ্ন মোমবাতি।

তুমি কি শুনতে পাও অন্য এক মিনারে আজান ?
কলবের ভিতর থেকে ডাক দেয়, নিদ্রা নয় নিদ্রা নয়, প্রেম,
সমুদ্রে খলিয়ে অজু বসে থাকে কবি এক বিষণ্ণ, নাদান।
সবার আরজি শেষ। বাকি এই বঞ্চিত আলেম।

আমার তস্‌বী শুনে হয়তোবা দ্রব হন তিনি
যার হাতে অদৃষ্টের অনিবার্য কলম,
কবিরও ভাগ্যের লিপি স্মিতহাস্যে লিখে যান যিনি
অদেখা ক্ষতের দাহে মেখে দেন আশার মলম।

তোমার সালাত শেষে যে দিকেই ফেরাও সালাম
বামে বা দক্ষিণে, আমি ওমুখেরই হাসির পিয়াসী ;
এখনও তোমার ওষ্ঠে লেগে আছে আল্লার কালাম
খোদার দোহাই বলো ও ঠোঁটেই, 'আমি ভালোবাসি।'

প্রভুর বিতান থেকে প্রেম আসে আদমের আত্মা হয়ে, নারী
পেরিয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ, ছায়াপথ, আণবিক মেঘের কুণ্ডল,

চুইয়ে প্রাণের রস গ্রহে গ্রহে কুয়াশা সঞ্চারি
কবির চোখের মধ্যে হয়ে যায় একবিন্দু জল।

আমার রোদনে জেনো জন্ম নেয় সর্বলোকে ক্ষমা
আরশে ছড়িয়ে পড়ে আলো হয়ে আল্লার রহম,
পৃথিবীতে বৃষ্টি নামে, শষ্পে ফুল ; জানো কি পরমা
আমার কবিতা শুধু অই দু'টি চোখের কসম।

ঝড় শেষে

ঝড় শেষ। দক্ষিনের দয়ালু বাতাস ফের, হায়
বলে, ফুলে ওঠো, হে গোটানো পালের মালিক
খুলে দাও দড়িদড়া, উড়ে যাক সমুদ্র শালিক,
একটি গাঙচিল দ্যাখো কম্পাসের কাঁটা হয়ে যায়।

মাস্তুলে নুনের দাগ মুছে ফেলে দাঁড়াও আবার
তোমার চলার দিক নির্ণীত হয়েছে বহু আগে
যন্দুর বাণিজ্যস্রোত যেতে হবে তারো পুরোভাগে
মৌসুমী বাতাসে আজকে কে ফোঁপায়, এ রোদন কার ?

তোমার সওদা হবে মানুষের কান্না খুঁজে ফেরা,
প্রতিটি বন্দর থেকে কিনে নিতে হবে অশ্রুজল
এর বিনিময়ে দাও একছিনা আশার কোহল

যেন স্বপ্নে ডুবে গিয়ে ভাবে এরা, দুনিয়ার ডেরা
এ শীতে কোথায় পেলো অলৌকিক মাঝির কম্বল
বন্দরে ফিরেছে তবে আমাদের হারানো ছেলেরা ?

তোমার মাস্তুলে

তোমার মাস্তুলে দ্যাখো উড়ে ফের বসেছে সে চিল
যার ডাকে গিয়েছিলো দুঃসাহসী কাপ্তানেরা সব,
ফিরবেনা জেনে তবু পান করে সীমাহীন নীল
জলের নিখিলে হলো নিরুদ্দেশ, নিহত নীরব।

তরংগে এ কার টুপী, দ্যাখো কার দাঁড়ের হাতল ?
এখনই এগোতে হবে যদি আরও চিহ্ন খোঁজো কিছু
হয়তো তুমিও পাবে সেই দ্বীপ ; ঘূর্ণিতোলা জল
যে মাটির চারপাশে মৃত্যু হয়ে ধায় পিছু পিছু।

মুক্তোর রহস্য নয়। জানতে হবে মৃত্যু কেন আসে
কেন রত্ন ফেলে দিয়ে দুনিয়ার কয়েকটি পাগল
জন-তরংগের থেকে নৈশব্দের নীলিমায় ভাসে

নির্বোধ দুনিয়া থাকে বহুদূর ঠেকিয়ে আগল।
ভাসাও এবার তবে সেই হিংস্র তরংগের পাশে
যেখানে জীবন নয়, মরণের অন্যনাম, জল।

তারার রাত

নগরের নীরব নিদ্রা
যখন যাদুর স্পর্শ
হানবে তোমার চক্ষে
তখন কি ভাবে সইবে ?

যখন নেশার মদ্য
রক্তে রন্ধ্রে জ্বালবে
বাসনার নীল বহ্নি
কিভাবে করবে সহ্য ?

গাঢ় তৃষ্ণার রাত্রি
তারার পেখম খুললে
ইচ্ছার কাল সর্প
কি মন্ত্রে আর ধরবে।

জেনো একদিন ভাঙবে
দেহের সোনার পাত্র
কালের অমোঘ হস্ত
সমাধির তৃণ বুনবে।

ঘটনা

বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। দরোজায় টোকা দিই সাহসে কুলোচ্ছে না। কার্নিসটে কপাট। বটের শিকড় ঝুলে পড়েছে ছাদ থেকে। কার্নিশের পাথর ফাটিয়ে বাতাসে লাফিয়ে পড়েছে পরগাছা। লতাগুল্মে জালের মত ঢাকা দিয়েছে সিঁড়ি। আমি কোথায় এসেছি তবে ? এ কার বাড়ি ? জিনের নিঃশ্বাসের মত নিঃশব্দে বাতাস বইছে। আমার চুল এলোমেলো। পরের গাড়ি-তেই দেশে ফিরে যাবো, ভাবছি। কাঁপছি।

দুয়ার খুলে গেল।

এক কিশোরী। ষোড়শী। হলদে কামিজের ওপর কালো দোপাট্টা। পাচাপা সালোয়ার, ধোয়া কচু পাতার মত রঙ। —আস্সালাম।—আপকা তারিফ ?
—মাহমুদ। দেহাত সে আয়া। মীর সাহাব মেরা মামু। বাচ্চা লোগোকো ফিকাহ্ পড়হানে......ও, আন্দর আইয়ে। ম্যায় হু রুদা। রুদাইনা ! আপকি বহিন। ইধর তশরিফ রাখ্খিয়ে ভেইয়া।

কদমবুসিতে নুয়ে পড়লো মেয়েটি। আমার বোন। মামাতো বোন। আমার মায়ের মত গায়ের রঙ। পানকৌড়ির উড়ালের মত চোখের ভানা। দীর্ঘ বেণী দাড়াশ সাপের মূর্ছাহত সঙ্গম যেন। নেকাবের মত কালো উর্ণায় বুক ঢেকে পালালো অন্দরে।

ফিরলো বাপ মাকে সঙ্গে নিয়ে। কুশল বিনিময়ের মধ্যে দেখি রুদার হাতে রুপোর গেলাস। রুহু আফজার শরবতে, ছেচা আদার গন্ধ এসে লাগলো নাকে। ঠোঁট ভিজিয়ে পান করলাম। তস্-নিমের তরল তৃপ্তি যেন সিনার রেকাবীতে উপচে জমা হলো।

কল্বের কোটোরায় প্রথম নাম রুদা। রুদাইনা ! হৃদয়ের কৃষ্ণবেণী ভগ্নি আমার। সন্ধ্যায় সুরা নাস আবৃত্তি করতে করতে রুদা আস-তো পড়ার টেবিলে। শিখতো না কিছুই, শুধু হাসি ছাড়া। পিতৃ-ভাষা শিখতে গিয়ে হাসতো—আমি বাংলা জবান জানি—আমি তোমাকে ভালোবাসি—আমি তোমাকে—বালিশে মুখ ঢেকে বিছানায় লুটিয়ে হাসতো।

একদিন এ খেলাও ফুরিয়ে গেল।

হার্টফেল হলো মামুর। তার আতরের দোকান থেকে ফিরেই উবুড় পড়লেন বিছানায়। চিকিৎসার আগেই স্পন্দনহীন পাথর। সংসার ভেঙে গেল। যেমন ভাঙে। ভাঙলো আমার আশ্রয়। লাল্ডিকোটালের মামী পানির দামে আতরের দোকানগুলো বিকিয়ে দিলেন। বাড়ি বিক্রির সময় বুদাকে চাইলাম। মামী হাসলেন, 'সবুর বেটা। আপনা মুলুক সে ওয়াপস আনে দো। রুদা তোম্হারাই হোগী।'

আমার সবুর মেওয়া মাকাল হয়ে ঝুলছে সারা বাংলায়। দ্যাখো, মানচিত্র ফেটে রক্ত বেরুলো ইতিহাসের। উলু মারার ভয়ে যে বালক ঘরে বাতি জ্বালাতো না সন্ধ্যায়, একাত্তরে হালাকুর ঘোড়ার পিঠে চাবুক হেনেছে সে। তার জয়ধ্বনিতে এদেশের মাটি ফুঁড়ে আকাশে মাথা তুলেছে স্বাধীনতার মিনার।

একদা ছিলাম বটে রাজপুত্র, শাক্যরাজকুলের সন্তান
আমার মাথায় ধরে শ্বেতচ্ছত্র পরাজিত ক্ষত্রিয়েরা কত
ভীড় ঠেলে এগোতো তোরণে। চরণ বন্দনা করে
পুষ্পার্ঘ্য দিতো যুবতীরা, গন্ধযুক্ত রক্তাভ চন্দনে
শরীর মর্দন করে গন্ধ জলে ধুয়াতো আমাকে।
চাপার সুরভি ভরা রেশমের বসনে তাঁতিরা
সোনার সুতোয় আঁকা নকশার ভেতরে গোপনে
রাখতো নাভির গন্ধ কস্তুরী-মৃগের।
মনে আছে ঘোড়াটিকে, বাতাসের মত বেগবান
ডেকেছি কন্টক বলে। তাম্রজালে ঢাকা কত রথে
আমাকে ভ্রমনে নিতে উৎসুক সারথি যুবারা
বলতো নমিত কণ্ঠে, ভাগ্যটিকা আমাকে করুক
শাক্যকুল ইন্দ্রের সারথি।
ছিলো নারী-প্রেয়সী, শ্রেয়সী, প্রিয়তমা,
গৌতমের সাথী, তাই ডাকা হতো গোপা নাম ধরে
আসলে সে যশোধারা—জম্বুদ্বীপে লাবণ্যের নদী।
একমাত্র পুত্র, সে-ও মুখখানি ভুলে গেছি কবে।

এখন বিদেহ রাজ্যে ক্ষীণস্রোতা মহীর কিনারে
নিঃসংগ পেতেছি শয্যা, চোখ রেখে রাতের আকাশে
অকস্মাৎ মনে হলো এ পৃথিবী তাপদগ্ধ কটাহের মত ;
মনে হলো বৃষ্টি চাই, নতুন জন্মের জন্যে চাই জল
অনর্গল শব্দময় উচ্ছ্বসিত মেঘের গুঞ্জন চাই।
দূরে গোপদের গ্রাম। প্রজ্জ্বলিত উনোনে এখন
চাষীদের অন্ন উথলায়। ঘরে ঘরে দুহিত গোধনে
পরিতৃপ্ত জনপদ। কিন্তু আমি জানি কর্মফলে
আবর্তিত হবে এরা। জলজ তৃণের মত ফের
জন্ম নেবে ধরিত্রীর মূত্রভেজা যোনির দেয়ালে।
এই গ্রামে আছে এক গোপালক, সদাহাস্য চাষী
ধণিয় কিষাণ বলে ডাকে লোকে, গোপী তার নারী
বহুপুত্রে ফলবতী মনোরমা, পরিতৃপ্ত মাতা।
গাভী ও বাছুর নিয়ে সুখী পুত্রগণ, জানে শুধু

বৃষ্টির বিলাপ মানে ধরণীর কামের ক্রন্দন।
তাই বীজ বুনে যায়, ডেকে আনে উদ্ভিদ, উদ্ভেদ
সবুজ চামড়া-অলা ঘায়ে ভরা উপমহাদেশে।

দিব্যচোখে চেয়ে থাকি, জন্মাবর্ত ঘোরে চক্রাকার
এক গর্ত থেকে জল অন্যগর্তে যেমন গড়ায়
তেমনি মাংসের দেনা শুষে নেয় সহ্যময়ী মাটি।
আমি শুধু চেয়ে থাকি, আর বলি, বৃষ্টি হোক তবে।

প্রতিটি কুটিরে আছে আচ্ছাদন, উনোনে আগুন
কিন্ত আমি অনর্গল, গৃহ নেই, বৃক্ষতলবাসি।
আমার পিপাসা নেই—তৃষ্ণারজ্জু ছিঁড়ে খুড়ে ফেলে
নিভিয়েছি মজ্জাগত আসক্তির অসহ অনল।

হে বায়ু, মরুতগণ, অতিধীরে নামো পৃথিবীতে
নেমে এসো ধাঁণয় চাষীর খেতে মহীর কিনারে
মহামেঘে ডুবে যাক কামনার কল্লোলিত সীমা।
আমি শুধু চেয়ে থাকি নীলিমায় আসক্তিরহিত
নিরুত্তেজ, নেত্রভাসে পূর্ব কোনো জন্মের জলায়।

ডানাঅলা মানুষ

জন্মেছিলাম এক দ্বীপদেশে। মনে হতো যেন
নগ্ন এশিয়ার লতাগুল্ম ঘেরা সপ্রতিভ নাভিতে
একটি সোনালি পাখি আমি। কিম্বা একটি
রুপোলি মাছ। যে স্বাদু জলে সাঁতার কাটতে কাটতে
এখন কান্‌কোতে নুনের স্বাদ লাগাতে
লাফিয়ে পড়বে সমুদ্রে।

না, সবি ছিলো স্বপ্ন। আমি তো পৃথিবীর
দরিদ্রতম দেশের দরিদ্রতম মানুষ। একজন
ডানাঅলা কবি। ডানা ?
হাঁ, পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানচিত্রের প্রায় প্রত্যেকটি
প্রাণীরই যেমন অদৃশ্য ডানা থাকে, তেমনি। থাকে
স্বপ্নের অলীক পাখনা।
উপোসী পেটে পাথর বেঁধে তারা উড়াল মারে আকাশে
মেঘের গম্বুজে বসে ডাকে আল্লাকে। হু হু শব্দের
ঘূর্ণি ঝড়ে, এমনি ফেরেশতারাও মানুষের ভাষা
শিখতে চায়। তাদের পাখার আওয়াজে নড়ে ওঠে গাছপালা।

আমি হতে চেয়েছিলাম তেমন মানুষ কবি—
যার কাছে আকাশ থেকে নেমে আসবে পাখিরা
মানুষের ভাষায় আল্লার নাম জপ করতে।
একদা এই ক্ষুধার্ত দেশের এক অদৃশ্য ডানার
হতভাগ্য প্রেসিডেন্টের সাথে আমার দেখা হয়ে
গিয়েছিল সমুদ্রে। গভীর রাতে। বংগোপসাগরে
চলমান এক বিশাল জাহাজের মাস্তুলের কাছে।

আমি বললাম, মহামান্য প্রেসিডেন্ট, আপনি
এখানে কী খুঁজছেন ? আপনার ঘুম পায় না ?
—আমি তেল খুঁজছি। দেখতে পাচ্ছোনা
তরংগের নীচে আমাদের জন্য তেলের শিরা বইছে ?
তুমি কতদূর দেখতে পাও, সামনে তাকাও
যতদূর দেখা যায় সবটাই বাংলাদেশ।
আমি অভিভূত হয়ে বল্লাম, মিষ্টার প্রেসিডেন্ট,

মনে হয় আপনি আমার মতই উড়তে পারেন। কিন্তু আপনার
ডানা কই ? ডানা দেখছি না কেন ?
—আছে। দ্যাখো সমুদ্র তরংগের মত তা লাফিয়ে ওঠে,
আর আকাশের মত নীল। ঘাতকের ভয়ে তা লুকিয়ে রাখি আড়ালে
কেউ দেখতে পায় না।

আবার তাকে দেখেছিলাম আরেক সমুদ্রে। জনসমুদ্রে।
মানুষের মিছিলের লবণাক্ত দরিয়া ছিলো সেটা।
তরংগ উঠছিল মানুষের হাতের। একটা কামানধারী গাড়িতে
তার কফিন ফুলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আমি তার ডানা দু'টির কি হলো—
খোঁজ করতে করতে সমুদ্রের মধ্যে নেমে গেলাম।
নামলাম, ঘাম আর চোখের জলের দরিয়ায়। কই সে ডানা
যা আকাশের মত নীল আর ঢেউয়ের মত
লাফিয়ে ওঠে বাতাসে ?

তোমার শপথে

ডানা নেই, তবু মনে হতো যেন আছে
আছে অদৃশ্যে পালকের সম্ভার,
আমার হৃদয়ে রক্তের খুব কাছে
তোমার অংগীকার।

তোমার শপথে স্বপ্নের পাখ্‌নাতে
জ্বলে ওঠে নীল শীতল অগ্নিকণা,
অসহ আগুন দহনলীলায় মাতে
ভস্মের মাঝে বেড়ে ওঠে তারি ফণা।

তুমি কি মৃত্যু ? তুমি কি বিনাশ তবে
নাকি ভালোবাসা ? ওগো কবরের ফুল,
আজো যদি বলো কবিতারই জয় হবে
মেলে দাও কালো চুল।

বাতাসের ঋতু

এসেছে ঝড়ের মাস। নড়বড়ে খুঁটি ধরে
কি করে যে হাসো ? বিগত শীতের লতা
টিনের চালায় তোলে শব্দের নূপুর।
গুনোর বাঁধন ছিঁড়ে দরমার বেয়াদপ ফালি
লাফিয়ে পড়তে-চায় আমাদেরই জোড়াতালি
প্রেমের ওপর।

অথচ তোমার চুল
সাপের জিহ্বার মত লাফাতে লাফাতে
কি করে যে হয়ে গেল বোশেখের অবিশ্বাসী ঝড়। আর
হাসির ছটাও গিয়ে মিশে যায়
ঈশানের এলোমেলো বিজুলীলতায়।

সবি তবে উড়ে যাবে ? খড়বিচালির সাথে
অতীতের সব বিনিময় ?
উড়ে যাবে কালো এক কিশোরীর প্রথম ব্যথার সেই
জলভরা সুখ ?
উঁহু উঁহু শীৎকার ?—বুঝি সভ্যতাকে শুষে নেয়
মেঘনাপারের কোনো গ্রাম। যে নবা চরের মাটি
অকস্মাৎ গলে যায় মানুষের ঘর্মাক্ত বপনে।
হৃদয়ের গভীর গোপনে বুঝি কেউ
বাজায় হলুদ লাউ। শুধু তার আঙুলের টানে
গুমরে গুমরে ফেলে যায় বোশেখের ঘূর্ণিতোলা বেগ।

কি করে যে হাসো ?
তোমার হাসির ছটা মিশে যায়
ঈশানের বিজুলীলতায়।

মৃগয়া

একটি হরিণ ডাক দিয়েছে মনের ভেতর
একটা চিতল বনের জন্তু
হরিনী তুই মুখ ঢেকে নে নীল অরণ্যে
নইলে যে তোর বুকের তন্তু

ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে প্রেমের জন্যে।

একটি পুরুষ ডাক দিয়েছে এক নগরে
তৃষ্ণা কাতর শুকনো মাটি
বালিকা তুই গা ঢাকা দে শহর ছেড়ে
নইলে যে তোর সোনার বাটি

সেই ভিখিরি জবরদস্তি নেবে কেড়ে।

নাতিয়া

কোনদিন আমি দেখবো কি কোনোকালে
সেই মুখ সেই আলোকোজ্জ্বল রূপ ?
এই দুনিয়ায় কিম্বা পেরিয়ে গিয়ে
মোহের পর্দা হায়াতের পর্দাকে,—
দেখবো নবীকে, আল্লার শেষ নবী
আছেন সেখানে, হৃদটির কাছে তার
স্ফটিকের মত স্বচ্ছ অমৃত জলে
ছায়া পড়ে যেনো ধরে নাম, কাওসার।

মোহাম্মদ—এ নামেই বাতাস বয়,
মোহাম্মদ—এ শব্দে জুড়ায় দেহ,
মোহাম্মদ—এ প্রেমেই আল্লা খুশী
দোজখ বুঝিবা নিভে যায় এই নামে।

ঐ নামে কত নিপীড়িত তোলে মাথা
কত মাথা দেয় শহীদেরা নির্ভয়ে,
রক্তের সীমা, বর্ণের সীমা ভেঙে
মানুষেরা হয় সীমাহীন ইয়াসীন।

এই নামে ফোটে হৃদয়ে গোলাপ কলি
যেন অদৃশ্য গন্ধে মাতাল মন,
যেন ঘনঘোর আঁধারে আলোর কলি
অকূল পাথারে আল্লার আয়োজন।

পাখীর কাছে ফুলের কাছে

ভরদুপুরে

মেঘনা নদীর শান্ত মেয়ে তিতাসে
মেঘের মতো পাল উড়িয়ে কী ভাসে !
মাছের মতো দেখতে এ কোন পাটুনী
ভরদুপুরে খাটছে সখের খাটুনি।
ওমা এ-যে কাজল বিলের বোয়ালে
পালের দড়ি আটকে রেখে চোয়ালে
আসছে ধেয়ে লম্বা দাড়ি নাড়িয়ে,
ঢেউয়ের বাড়ি নাওয়ের সারি ছাড়িয়ে।

কোথায় যাবে কোন উজানে ও-মাঝি
আমার কোলে খোকন নামের যে-পাজি
হাসছে, তারে নাও না তোমার নায়েতে
গাঙ-শুশুকের স্বপ্নভরা গাঁয়েতে ;
সেথায় নাকি গালুক পাতার চাদরে
জলপিপিরা ঘুমায় মহা আদরে,
শাপলা ফুলের শীতল সবুজ পালিশে
থাকবে খোকন ঘুমিয়ে ফুলের বালিশে।

আকাশ নিয়ে

আকাশটাকে নিয়ে আমার মস্ত বড়ো খেলা,
মেঘের কোলে ভাসাতে চাই চিলেকোঠার ভেলা।
বাতাস যখন থমকে গিয়ে শান্ত হয়ে রয়
মেঘের ঈগল ভেঙে কেবল ফুলের তোড়া হয় ;
জলকদরের খাল পেরিয়ে জলপায়রার ঝাঁক
উড়তে থাকে লক্ষ্য রেখে শঙ্খনদীর বাঁক।
মন হয়ে যায় পাখি তখন, মন হয়ে যায় মেঘ
মন হয়ে যায় চিলের ডানা, মিষ্টি হাওয়ার বেগ।
আবার যখন সন্ধ্যা নামে ছড়িয়ে কালোর ছিট
আকাশটাতে কে এঁকে দেয় নীল হরিণের পিঠ।
ব্রহ্মদেশের বাতাস এসে দরজা টানে রোজ
কোথায় পেলো আমার মতো দুষ্টু ছেলের খোঁজ

ছড়া

লিয়ানা গো লিয়ানা
সোনার মেয়ে তুই,
কোন পাহাড়ে তুলতে গেলি—
জুঁই।

বন-বাদাড়ে যাইনি মাগো
ফুলের বনেও না,
রাঙা খাদির অভাবে মা
পাতায় ঢাকি গা।

চিবিদ গাছের ছায়ার পিনোন্
অঙ্গে জড়িয়ে,
পাঁচ পাহাড়ের খাদের নিচে
যাচ্ছি গড়িয়ে।

ছড়া

চাকমা মেয়ে রাকমা
ফুল গোঁজে না কেশে
কাপ্তাইয়ের ঝিলের জলে
জুম গিয়েছে ভেসে।

জুম গিয়েছে ঘুম গিয়েছে
ডুবলো হাঁড়িকুড়ি,
পাহাড় ডোবে, পাথর ডোবে
ওঠে না ভুরভুরি।

একুশের কবিতা

ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ
দুপুরবেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায় ?
বরকতের রক্ত।

হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে, এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে !

প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।

চিনতে না কি সোনার ছেলে
ক্ষুদিরামকে চিনতে ?
রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিলো যে
মুক্ত বাতাস কিনতে ?

পাহাড়তলীর মরণ চূড়ায়
ঝাঁপ দিল যে অগ্নি,
ফেব্রুয়ারীর শোকের বসন
পরলো তারই ভগ্নী।

প্রভাতফেরী, প্রভাতফেরী
আমায় নেবে সঙ্গে,
বাংলা আমার বচন, আমি
জন্মেছি এই বঙ্গে।

নোলক

আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।
নদীর কাছে গিয়েছিলাম, আছে তোমার কাছে ?
—হাত দিওনা আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে।
বললো কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে
শাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে।
জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সবুজ বনের হরিৎ টিয়ে করে রে ঝিকমিক
বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই,
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরকে যেতে চাই।

কোথায় পাবো তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
আমরা তো সব পাখপাখালি বনের সাধারণ।
সবুজ চুলে ফুল পিন্দেছি নোলক পরি না তো !
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও, হাত পাতো হাত পাতো-
বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার ভরা বুক।
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।

পাখির মতো

আম্মা বলেন, পড়রে সোনা
আব্বা বলেন, মন দে ;
পাঠে আমার মন বসে না
কাঁঠালচাঁপার গন্ধে।

আমার কেবল ইচ্ছে জাগে
নদীর কাছে থাকতে ,
বকুল ডালে লুকিয়ে থেকে
পাখির মতো ডাকতে।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে
কর্ণফুলীর কূলটায়।
দুধভরা ঐ চাঁদের বাটি
ফেরেস্তারা উল্টায়।

তখন কেবল ভাবতে থাকি
কেমন করে উড়বো,
কেমন করে শহর ছেড়ে
সবুজ গাঁয়ে ঘুরবো !

তোমরা যখন শিখছো পড়া
মানুষ হওয়ার জন্য,
আমি না হয় পাখিই হবো,
পাখির মতো বন্য।

ঊনসত্তরের ছড়া-১

ট্রাক ! ট্রাক ! ট্রাক !
শুয়োরমুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ।

কেন বাঁধবো দোর জানালা
তুলবো কেন খিল ?
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
ফিরবে সে মিছিল।

ট্রাক ! ট্রাক ! ট্রাক !
ট্রাকের মুখে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক।

কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে আছে সে !
তোরাই তবে সোনামাণিক
আগুন জেবলে দে।

ঊনসত্তরের ছড়া-২

কারফিউ রে কারফিউ,
আগল খোলে কে ?
সোনার বরণ ছেলেরা দেখ্
নিশান তুলেছে।

লাল মোরগের পাখার ঝাপট
লাগলো খোঁয়াড়ে
উটকোমুখো সান্ত্রী বেটা
হাঁটছে দুয়ারে।

খড়খড়িটা ফাঁক করে কে
বিড়াল-ডাকে 'মিউ'.
খোকন সোনার ভেংচি খেয়ে
পালালো কারফিউ।

মনপবনের নাও

শিশির ঝরার রাত্রি এখন
চাঁদটা কেবল ঠান্ডা
মস্ত নীলের তস্তরিতে
সী-মোরগের আন্ডা।

তাঁতীপাড়ার রাঙা মামীর
মাকুর ঠেকা ফুটছে
মেঘনা নদী বুবুর শাড়ির
নকশা হয়ে উঠছে।

আর কি এখন লাগবে ভালো
গণিত কিংবা গদ্য ?
তার চেয়ে ঐ অঙ্ক খাতায়
বানাও নতুন পদ্য।

মনপবনের নাও হয়ে যাও
বন্ধ রেখে বইটা,
শতেক মাঝির পাল খাটানো
জল ফাটানো বৈঠা।

গাঁয়ের দিকে উড়াল মারো
শব্দ চুরির ইচ্ছায়
ইচ্ছেমত শব্দ পাবে
দাদী নানীর কিচ্ছায়।

চিলের মত ওপর থেকে
মিলের দিকে ঝুঁকবে,
শীতলপাটি বিলের পানি
একটুখানি শুঁকবে।

শুকনো নদীর তলপেটে ঐ
ড্রেজার যখন হাতড়ায়,
ধানের খেতে পাওয়ার টিলার
ক্লান্ত হয়ে কাৎরায়—

কান্না থেকে কাব্য লেখার
চাও কি কোন মওকা ?
দুঃখী লোকের চরের কাছে
ভিড়াও তবে নৌকা।

পাখির কাছে ফুলের কাছে

নারকোলের ঐ লম্বা মাথায় হঠাৎ দেখি কাল
ডাবের মতো চাঁদ উঠেছে ঠাণ্ডা ও গোলগাল।
ছিটকিনিটা আস্তে খুলে পেরিয়ে গেলাম ঘর
ঝিমধরা এই মস্ত শহর কাঁপছিলো থরথর।
মিনারটাকে দেখছি যেন দাঁড়িয়ে আছেন কেউ,
পাথরঘাটার গীর্জেটা কি লাল পাথরের ঢেউ?
দরগাতলা পার হয়ে যেই মোড় ফিরেছি বাঁয়
কোত্থেকে এক উটকো পাহাড় ডাক দিলো আয় আয়।

পাহাড়টাকে হাত বুলিয়ে লালদিঘিটার পার
এগিয়ে দেখি জোনাকিদের বসেছে দরবার।
আমায় দেখে কলকলিয়ে দিঘির কালো জল
বললো, এসো, আমরা সবাই না ঘুমানোর দল—
পকেট থেকে খোলো তোমার পদ্য লেখার ভাঁজ
রক্তজবার ঝোপের কাছে কাব্য হবে আজ।
দিঘির কথায় উঠলো হেসে ফুল পাখিরা সব
কাব্য হবে, কাব্য হবে—জুড়লো কলরব।
কি আর করি পকেট থেকে খুলে ছড়ার বই
পাখির কাছে, ফুলের কাছে মনের কথা কই।

হাসির বাক্‌সো

হাসির বাক্‌সো কোথা আছে যদি জানতাম সন্ধান
যতবড়ো তার চাবি হোক ভাই আনতাম খুঁজে খুঁজে ;
আমার গায়ের সবটুকু জোরে মারতাম এক টান,
সেই বাক্‌সোটি ভাঙতো আমার শক্তির সাথে যুঝে।

মিষ্টি-মধুর হাসিগুলো নিয়ে ছড়াতাম চারদিক,
পৃথিবীর বুকে, শিশুদের মুখে, খেলা করবার মাঠে ;
হাসিগুলো ঠিক বহুদিন ধরে করতোই ঝিকমিক,
পৃথিবীর বুকে, শিশুদের মুখে, খেলা করবার মাঠে।

তারপর এক বিরাট বাক্‌সো খুঁজতাম প্রতি ঘরে,
নিশ্চয়ই জেনো বেছে আনতাম বিশাল বাক্‌সো এক,
পাঠশালা আর পথের কান্না জমাতাম থরে থরে—
অশ্রু এবং দুঃখ-কষ্টে মানুষের উদ্বেগ।

অবশেষে এক দৈত্যকে ডেকে বললাম কানে কানে,
পৃথিবীর সব দুঃখ-কষ্ট বন্দী করেছি আমি,
কাঁধে তুলে নিয়ে ফেলে দাও ওটা দরিয়ার মাঝখানে
হাসিভরা এই পৃথিবীটা হোক স্বর্গের চেয়ে দামী।

রাতদুপুরে

সবাই ঘুমিয়ে গেল রাতদুপুরে
চুপিসারে চলে এসে খোলো জানালা,
নিশীথের নিরালায় নীল মুকুরে
দেখো দেখো, ভেসে যায় সোনার থালা।

সোনার বাসন কে যে আঁকে তিতাসে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছলকায় রুপোর টাকা,
লোক নেই, জন নেই, পানির পাশে
গাছগুলো মনে হবে দুঃখমাখা।

নীরব বাতাস বেয়ে ভয়ের পাখি
হঠাৎ উড়াল দিয়ে আমের ডালে,
ভয়ের ভাষায় একা উঠবে ডাকি,
'নিম্ নিম্' ভেসে যাবে জ্যোস্নাজালে।

ভূত নেই, ভয় নেই, দেখবে তুমি
যদি যাও জানালায় রাতদুপুরে,
আদিম বাংলাদেশে—বঙ্গভূমি
সকালে হারিয়ে যায় অনেক দূরে।

বোশেখ

যে বাতাসে বুনোহাঁসের ঝাঁক ভেঙে যায়
জেটের পাখা দুমড়ে শেষে আছাড় মারে
নদীর পানি শূন্যে তুলে দেয় ছড়িয়ে
নুইয়ে দেয় টেলিগ্রাফের থামগুলোকে।

সেই পবনের কাছে আমার এই মিনতি
তিষ্ঠ হাওয়া, তিষ্ঠ মহাপ্রতাপশালী,
গরিব মাঝির পালের দড়ি ছিঁড়ে কী লাভ ?
কি সুখ বলো গুঁড়িয়ে দিয়ে চাষীর ভিটে ?

বেগুন পাতার বাসা ছিঁড়ে টুনটুনিদের
উল্টে ফেলে দুঃখী মায়ের ভাতের হাঁড়ি
হে দেবতা, বলো তোমার কি আনন্দ,
কী মজা পাও বাবুই পাখির ঘর উড়িয়ে।

রামায়ণে পড়েছি যার কীর্তিগাথা
সেই মহাবীর হনুমানের পিতা তুমি ?
কালিদাসের মেঘদূতে যার কথা আছে
তুমিই নাকি সেই দয়ালু মেঘের সাথী ?

তবে এমন নিঠুর কেন হলে বাতাস
উড়িয়ে নিলে গরিব চাষীর ঘরের খুঁটি
কিন্তু যারা লোক ঠকিয়ে প্রাসাদ গড়ে
তাদের কোনো ইট খসাতে পারলে নাতো।

হায়রে কতো সুবিচারের গল্প শুনি,
তুমিই নাকি বাহন রাজা সোলেমানের
যার তলোয়ার অত্যাচারীর কাটতো মাথা
অহমিকার অট্টালিকা গুঁড়িয়ে দিতো।

কবিদের এক মহান রাজা রবীন্দ্রনাথ
তোমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন করজোড়ে
যা পুরনো শুষ্ক মরা, অদরকারী
কালবোশেখের একটি ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে

ধ্বংস যদি করবে তবে, শোনো তুফান
ধ্বংস যদি করো বিভেদকারী পরগাছাদের
পরের শ্রমে গড়ছে যারা মস্ত দালান
বাড়তি তাদের বাহাদুরী গুঁড়িয়ে ফেলো।

তারিকের অভিলাষ

একবার পাখিদের ভাষাটা যদি
শেখাতেন সোলেমান পয়গম্বর।
জানতাম পাতাদের আড়ালে তারা
খড় দিয়ে কেন গড়ে ঘর সুন্দর ;

কোন সুখে আকাশের নীল অঙ্গন
ভেঙে দেয় পাখিদের প্রাণ-সঙ্গীত
পাই যদি পাখালির প্রান্তিক মন
ছুঁই তবে আকাশের নীল অন্তর—

একবার পাখিদের ভাষাটা যদি
শেখাতেন সোলেমান পয়ম্গর।

দেখবো তুফান আর ঝড় বৃষ্টি
কেবলি মেলবো পাখা দূর শূন্যে
আমার শহর ছেড়ে উড়বো একা
পাখির মেজাজ যদি পাই পুণ্যে।
মাঠে ঘাটে পড়ে থাকে যেই খাদ্য
ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে তুলবো আমি
পাখিদের বাধা দেয় কার সাধ্য
এ-ভাবে কাটাতে চাই আমার প্রহর—

একবার পাখিদের ভাষাটা যদি
শেখাতেন সোলেমান পয়ম্বর।

ঝালের পিঠা

ঝালের পিঠা, ঝালের পিঠা
কে রেঁধেছে কে ?
এক কামড়ে একটুখানি
আমায় এনে দে।

কোথায় পাবো লঙ্কাবাটা
কোথায় আতপ চাল,
কর্ণফুলীর ব্যাঙ ডাকছে
হাঁড়িতে আজকাল।

আমিই শুধু

ঘুমিয়ে সবাই স্বপ্ন দেখে
রাতে, গভীর রাতে
আমার খোয়াব হাঁটিতে থাকে
দীপ্ত আলোর প্রাতে।

পাখিরা সব আহার খোঁজে
মানুষ খোঁজে কাজ,
আমিই একা ভোরের আলোয়
খুলি মেঘের ভাঁজ।

সবুজ পাতার মধ্যে বসাই
লালের ছিটা, ফুল ;
হাওয়ার চোটে লাফিয়ে ওঠে
আমার মাথার চুল।

কোথায় ঘোড়া ? ঘোড়া তো নেই
স্বপ্নঘোড়ার পা
মেঘের ধুলো ছিটিয়ে ছোটে
নীহারিকার গাঁ।

ফেব্রুয়ারীর সকাল বেলায়
বইয়ের গন্ধ শুঁকে
আমার কেবল মাথা ঘোরায়
কষ্ট বাড়ে বুকে।

তাই দিয়েছি উড়াল আমি
ছড়িয়ে মেঘের পাল,
থাকুক পড়ে পাটিগণিত
শুভংকরের চাল।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ পরিচয়

লোক লোকান্তর ॥ রচনাকাল : ১৩৬১-১৩৭০ সাল। প্রথম প্রকাশ : ১লা পৌষ ১৩৭০। প্রকাশক : মুহম্মদ আখতার। কপোতাক্ষ, পোস্ট বক্স নং ২৭০, ঢাকা—২। মুদ্রণ : সুষম সরবরাহ, ৩৪ আগামসিহ্ লেন, ঢাকা—২-এর পক্ষে তফাজ্জল হোসেন, নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা—৩। মুদ্রণ নির্দেশনা : ফজল ইমাম। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। দাম : আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা : ৬৪। উৎসর্গ : আব্বা-আম্মাকে।

দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৭৩। প্রকাশক : কাদির খান। নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা—১। মুদ্রণ : এন. হক, মর্ডান টাইপ ফাউন্ডার্স, প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিঃ, ২৪৪ নবাবপুর, ঢাকা—২। প্রচ্ছদ : ডঃ নওয়াজেশ আহমদ ও কালাম মাহমুদ। দাম : পাঁচ টাকা।

প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থকে স্বাগত জানিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ লেখেন : '···তাঁর নিচু কণ্ঠস্বরে তিনি তাঁর অনুভবের কথা, তাঁর পারিপার্শ্বিক কম্পমান অগ্রসরমান জীবনের কথা বলে গেছেন। ···এক সুস্থ-স্বস্থ-স্বচ্ছ আত্মকেন্দ্রিক জগতের অধিবাসী এই কবি সযত্ন ও পরিচ্ছন্ন ছন্দ ও ভাষার অধিকারী।' ['সমকাল' : কবিতা সংখ্যা,]

কালের কলস ॥ রচনাকাল : ১৩৭০-৭৩ সাল। প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৭৩। প্রকাশক : নাসিম বানু, বইঘর, ফিরিঙ্গী বাজার রোড, চট্টগ্রাম। মুদ্রণ : সৈয়দ মোহাম্মদ শফি, আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। দাম : তিন টাকা। পৃষ্ঠা : ৫৪। উৎসর্গ : এখ্লাসউদ্দিন আহমদ বন্ধুবরেষু।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালে কলকাতার বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে।

তৃতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৭২। প্রকাশক : বইঘর। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। দাম : ছয় টাকা।

'কালের কলসে' কোন সূচীপত্র নেই। প্রথম সংস্করণ ক্রাউন আকারের এবং পরবর্তী সংস্করণ দুটি একের ষোল ডিমাই আকারের। প্রথম এবং তৃতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদ শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী হলেও দুটি প্রচ্ছদই সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথমটি দুই রঙে আঁকা এবং শেষোক্ত প্রচ্ছদটি এক রঙের।

এই গ্রন্থের এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত অন্যান্য কবিতাকে উপলক্ষ করে হাসান মুরশিদ (গোলাম মুরশিদ) কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় লেখেন : আল মাহমুদের ভাষা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব। যে মগ্নচৈতন্য থেকে ভোরের সহজ আলোর মতো তাঁর অনুভূতি ঝরে পড়ে,

তারই উপযোগী ভাষা তাঁর আয়ত্তাধীন। আলো-আঁধারী ভাষায়, আভাসে ইঙ্গিতে তিনি তাঁর হৃদয়ের কথা আধখানা ব্যক্ত করেন, বাকি আধখানা পূরণ করে নিতে হয় পাঠককে। পল্লীর শব্দ ও প্রবাদপ্রবচনকে আধুনিক কোনো কবি সম্ভবত এমন নিপুণ ও শৈল্পিক ভঙ্গিতে ব্যবহার করেননি। পল্লীর উপাদান থেকে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর উপমা ও চিত্রকল্প। প্রকৃত পক্ষে, তিনি কাব্যের ভাষাক্ষেত্রে এক অপূর্ব সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। জসীমউদ্দীন যেখানে লোকসাহিত্যের উপাদানের ওপর তাঁর কুটির তৈরি করেন, আল মাহমুদ সেখানে আধুনিক এক প্রাসাদের কারুকার্যে লৌকিক উপাদান ব্যবহার করেন। কেননা, আল মাহমুদ অত্যন্ত সংবেদনশীল, সচেতন ও বিদগ্ধ শিল্পী, তাঁর উপলব্ধির গভীরতা জসীমউদ্দীনের তুলনায় অতলস্পর্শী। তদুপরি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত—ছন্দের এই ত্রিবিধ চলনেই বর্তমান কবির স্বচ্ছন্দ বিহার অনেকের কাছেই ঈর্ষার বস্তু হতে পারে।' [পূর্ববাংলার সাহিত্য : কবিতা, 'দেশ', ১০ জুলাই]

আল মাহমুদের কবিতা ॥ প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৪৮ (ডিসেম্বর ১৯১৭)। প্রকাশ : বিভাস বাগচী, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাশ লেন, কলকাতা-৬। পরিবেশক : সিগনেট বুক শপ, কলকাতা ১২। মুদ্রণ : এস, রায়, বিদ্যুৎ প্রিন্টিং প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলকাতা-৬, বাঁধাই : অশোকা বাইন্ডিং ওয়ার্কস, ৫০ পটলডাঙা স্ট্রীট, কলকাতা-৯। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী। পৃষ্ঠা : [১২]+১২০, উৎসর্গ : নাদিরাকে।

এই গ্রন্থে সংকলিত মোট কবিতা সংখ্যা পঁচাশি। এতে 'লোক লোকান্তর' থেকে বত্রিশ, 'কালের কলস' থেকে ছাব্বিশ এবং সে সময়ে অপ্রকাশিত সোনালি কাবিন ও পাখির কাছে ফুলের কাছে, থেকে যথাক্রমে বাইশ ও পাঁচটি কবিতা সংকলিত হয়েছিল।

গ্রন্থটি প্রকাশের পরে অনতিবিলম্বে কলকাতার একাধিক পত্র-পত্রিকায় আলোচনা ছাপা হয়। অমিতাভ দাশগুপ্ত লেখেন : 'সোজা কথা, আল মাহমুদের এতাবত লেখা কবিতাবলীর বাছাই সংকলটি পড়ে আমি এই খুঁতখুতে ছত্রিশ বছর বয়সেও তাজ্জব বনে গেছি।

...পশ্চিম বাংলার সমবয়স্ক কবিদের অজানিত তাই অন্ত্যজ শব্দ ও লোকচিত্র তুলে ধরে তিনি আমাদের সামনে এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ আলোকময় করে তুলে ধরেছেন।

...আমাদের শুষ্ক তাপদগ্ধ, ভ্রান্তিময় কাব্যানুভূতির মরুতে এই সংকলন পরম শুশ্রূষার জলধারার মতো। আল মাহমুদের কবিতা আমাদের সামগ্রিক স্বার্থেই ব্যাপকভাবে পড়া ও বোঝা দরকার। কারণ তাঁর কবিতা এক অর্থে বাংলা কবিতারই পুনরুজ্জীবন। ['বেলা অবেলা', কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৮]

সনাতন পাঠক (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) লেখেন : '...গভীর প্রত্যয়ের কথা লিখতে গিয়েও আল মাহমুদকে কখনো চেঁচামেচি করতে হয়নি বা জঙ্গী ভাব দেখাতে হয়নি।

কবি হিসাবে আল মাহমুদের বৈশিষ্ট্য দুটি। নিখুঁত শব্দ ব্যবহারের দুর্লভ

ক্ষমতা আছে তাঁর। নিখুঁত শব্দ বলতে মসৃণ বা মিষ্টি শব্দ বলে যেন ভুল বোঝা না হয়। বস্তুত, তাঁর প্রত্যেকটি শব্দই অবধারিত।···
আল মাহমুদের দ্বিতীয় গুণ, তিনি প্রচলিত শব্দের একঘেয়েমি ভাঙার জন্য কথ্য ও গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন স্বাধীনভাবে।···রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কবিতায় এটাই হতে পারে স্বাস্থ্যকর প্রয়াস।

···আমার ধারনা, আল মাহমুদ তাঁর এই ঝোঁকের জন্য ক্রমশ আরও মহৎ হয়ে উঠবেন।' ['দেশ', ১৯ জানুয়ারী, ১৯৪২ কলকাতা]
রাম বসু লেখেন, 'আল মাহমুদ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল কবি। তাঁর ছন্দের সিদ্ধি এবং বাক্প্রতিমার সৌষ্ঠব আনন্দ দেয়। তিনি এমন উদারভাবে তাঁর মানসিক জগৎকে উন্মোচিত করে দেন, এমন অনাড়ম্বর সরলতায় নিজেকে প্রকাশ করেন যে আমরা চমকে উঠি হঠাৎ আবিষ্কারের বিস্ময়ে। নিজের জীবনের অনুষঙ্গ থেকে দেশের সামগ্রিক সংবাদকে তিনি অনায়াসে স্বচ্ছন্দে কবিতায় বিধৃত করতে পারেন। অনাবিল নির্মলতায় নিয়ে আসেন নিসর্গ। তখন মানুষ ও প্রকৃতির কৃত্রিম কলহ আর থাকে না। এক আনন্দময় স্তব্ধতা আমাদের আপ্লুত করে। এ-কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, নিসর্গ সম্বন্ধে ইয়োরোপের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অসাধারণ। ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করলে হিন্দু ও মুসলিম মানসিকতায় এই নিসর্গ বাইরের কোনো আরোপিত জিনিস নয়, বিশ্ব-চেতনার সঙ্গে তা অঙ্গীভূত। ইয়োরোপের আধুনিকতা নিসর্গ বর্জন করেছে বলে পশ্চিম বাংলার কিছু কবি তাই করতে যথেষ্ট তৎপর এবং বিব্রত। সুখের কথা আল মাহমুদ তা করেননি।' ['পরিচয়' পৌষ-মাঘ ১৯৪৮]

সোনালি কাবিন ‖ রচনা কাল : ১৯৪৯-৪৩। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭৩ আশ্বিন ১৩৮০। প্রকাশক : আরিফ খান, প্রগতি প্রকাশনী, ৪/৪ শাহবাগ বিপনী বিতান, ঢাকা-২। মুদ্রণ : বুক প্রমোশন প্রেস, ২৮ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা। প্রচ্ছদ : ডঃ নওয়াজেশ আহমদ ও কালাম মাহমুদ। দাম সাড়ে পাঁচ টাকা। পৃষ্ঠা : ৭২। উৎসর্গ : শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, শহীদ কাদরী—আমাদের এক কালের সখ্য ও সাম্প্রতিক কাব্য-হিংসা অমর হোক।

কলকাতা থেকে ১৯৪১ সালে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সোনালি কাবিন' শীর্ষক ১৪টি সনেট নিয়ে সাড়ে চার ইঞ্চি × সাড়ে তিন ইঞ্চি সাইজের মিনিবুক সিরিজে 'সোনালি কাবিন' প্রকাশিত হয়। মূল্য ষাট পয়সা। সুমুদ্রিত ও পরিচ্ছন্ন এই পুস্তকটি মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। বর্তমানে পুস্তিকাটি দুষ্প্রাপ্য।

সোনালি কাবিন সনেটগুচ্ছের প্রকৃতি নির্ণয় প্রসঙ্গে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর লেখেন : 'সোনালী কাবিন' : এই দীর্ঘ কবিতার মধ্যে আসছে প্রতীকী ভাষণ ; নিখুঁত বর্ণনা ; আবেগ স্পন্দিত স্তবক ; বিচ্ছিন্ন সুন্দর লাইন। অতীতের ব্যবহার তিনি করেছেন অতীতের ভিত্তিতে, প্রতিটি পর্বের স্টাইলের মধ্যে যাপন করেছেন, ফলে অতীত হয়ে উঠেছে এক ধরনের বর্ত-

মান। বর্তমান : অতীতকে ইমারতের মতন গড়ে তোলার জন্য তিনি এক চরিত্র ব্যবহার করেছেন বাঙালী মনোস্বভাবের প্রতিনিধি হিসাবে। ঐ ব্যক্তি বাঙালী, কবি, আবহমান মানুষ, ইতিহাসের মধ্যে হৃদয়ের ইতিহাস গেঁথে দিয়েছেন, জনপদ, শস্য, হৃদয় সবই এক মহাসত্যের বিভিন্ন দিক। আর শব্দ আবহমান, চিরকালীন গ্রামীণ এবং লোকজ। আল মাহমুদের কৃতিত্ব এখানেই।' ['দৈনিক বাংলা', ২২শে জুলাই, ১৯৭৩]

'সোনালি কাবিন' প্রকাশের পরে তাঁর কবিকৃতি সম্পর্কে শিবনারায়ণ রায় মন্তব্য করেন : 'Al Mahmud has an extraordinary gift for telescoping discrete levels of experience ; in his poems I find a mervellous fusion of passion and wit which reminds me occasionally of Bishnu Dey. The complete secularism of his approach is also striking, more so,......he was born and brought up in a very conservative Muslim religious family ; it is not a secularism forced by some ideology, but present naturally and ubiquitously in his metaphors, images and themes. [I Have seen Benggl's Face - Sibnarayan Roy and Marian Maddern (Ed.)]

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ লেখেন : 'আঞ্চলিক ভাষার শব্দ-সম্ভার এবং বাকরীতি আল মাহমুদের কবিতায় ব্যবহৃত, এবং পরিশীলিত মনের স্পর্শে, সেগুলো গ্রামীণ হয়েও, ব্যবহার-কৌশলে বাঙময়। ঐতিহ্যের অনুসারী ; বিশেষতঃ তাঁর সনেট আঙ্গিকের কবিতায় প্রচলিত রীতি-ভঙ্গির অনুসরণ লক্ষ্যযোগ্য।' [উত্তরাধিকার' : জানুয়ারী-মার্চ]

মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো ॥ রচনাকাল :। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৫২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬। প্রকাশক : গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ, সন্ধানী প্রকাশনী, ৪১ নয়াপল্টন, ঢাকা ২। মুদ্রণ : বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ বিভাগ। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। দাম : সাত টাকা। পৃষ্ঠা : ৫৪। উৎসর্গ : হাসান আজিজুল হক।

অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না ॥ রচনাকাল ১৯৪৭ । প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮০। প্রকাশক : মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান, আধুনিক প্রকাশনী, ১৩/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১। মুদ্রণ : বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ সবিহ উল আলম। দাম : নয় টাকা। পৃষ্ঠা : ৫৪। উৎসর্গ : আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আসাদ চৌধুরী।

এই গ্রন্থভুক্ত নীলের শিথানে, আরোহণ ও অস্খলন কবিতাত্রয় ১৩৬১ থেকে ১৩৭০-এর মধ্যে রচিত এবং এযাবৎ অগ্রন্থিত ছিল।

পাখির কাছে ফুলের কাছে ॥ রচনা কাল : ১৯৪৪ । প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৫০। প্রকাশক : বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা ২। মুদ্রণ : বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস, ৩/৪, পুরানা পল্টন, ঢাকা। প্রচ্ছদ, ভেতরের ছবি ও অঙ্গসজ্জা : হাশেম খান। দাম : ছয় টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৩২। উৎসর্গ : আতিয়া, তানিয়া ও ফাতিমা-কে।

'কালের কলস' থেকে তারিকের অভিলাষ এবং সোনালি কাবিন, থেকে নোলক, উনসত্তরের ছড়া ১, ২ ও বোশেখ—এই পাঁচটি কিশোর—কবিতা বর্তমান বইয়ে যুক্ত করা হয়েছে।

১.
আল মাহমুদের কবিতা ইংরেজী, ফরাসী, জর্মান, রুশ, ভিয়েতনামী, ইরানী, হিন্দী, উর্দু, ওড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যে সব সংকলন গ্রন্থে তাঁর কবিতা সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :
'পূর্ববাংলার কবিতা' : শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা,
'স্ব-নির্বাচিত' : শান্তনু দাস ও রুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত, অনির্বাণ প্রকাশনী, কলকাতা,
'আধুনিক কবিতা' : রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,

The Voice of a New Nation : Poems from Bangladesh, ed. Pritish Nandy, Lyrebird Press, London,

Kavita Bangladesh Ki : ed. Pritthinath Shastri and Monomohon Tagore, Suparna, Howrah, West Bengal, India,

Voices of Modern Asia : ed. Dorothy Blair Shimer, A Mentor Book, New York,

Sankalpa Sangram Sankalpa : ed. Vishnu Kant Shastri, Bharatiya Janapith, Delhi,

CBET BOZROJ : an anthology of Poems from Bangladesh, Moscow,

Sherhaye Aj Bengladesh : an anthology of Pooms from Bangladesh, Tehran,

Eskermish : an anthology of Poems from Bangladesh, ed. M. Salganik, AlmaAta, USSR, 1973

Poems du Bangla-Desh : ed. Prithendra Mukharjee, Paris, 1974

I Have Seen Bangal's Face : ed. Sibnarayan Roy and Marian Maddern, Calcutta Edition,

GANGESDELTA : ed. Lother Lutze and Alokeranjan Dasgupta Horst Erdman Verlage,

Three Poets : ed. M. Harunur Rashid, Bangladesh Books International, Dacca,

Bangali Academy Journal : Special Poetry Number, ed, Ashraf Siddique. Bangla Academy, Dacca, Nov-March,

২.
আল মাহমুদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে যে সব গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় আলোচনা আছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :
লোকজ বাস্তবে আল মাহমুদের কবিতা ॥ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'দৈনিক বাংলা', ২২শে জুলাই

সাম্প্রতিক কবিতা : আল মাহমুদ ¶ আবদুল হাফিজ, 'আধুনিক সাহিত্য-চর্চা', মুক্তধারা,
পঁচিশ বছরের কবিতা ¶ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, 'উত্তরাধিকার', জানুয়ারী-মার্চ,
'সাম্প্রতিক কবি সাম্প্রতিক কবিতা' ¶ বশীর আল হেলাল,
আল মাহমুদ ও তাঁর কবিতা ¶ ইজাজ হোসেন 'উত্তরাধিকার' ৫ম বর্ষ : ৯-১০ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
আল মাহমুদ ¶ আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'করতলে মহাদেশ', নলেজ হোম, ঢাকা,
আল মাহমুদ ¶ সৈয়দ আলী আহসান, 'ইত্তেফাক', ২৪, ৩১ আগস্ট, ৭ সেপ্টেম্বর,

৩·

আল মাহমুদ রচিত অন্যান্য গ্রন্থ :
পানকৌড়ির রক্ত (গল্প) ¶ বর্ণমিছিল,
সঙ্গীত সিরিজ-১ (গুলমোহাম্মদ খান, কানাইলাল শীল, ফুলঝুরি খান) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী,
সৌরভের কাছে পরাজিত (গল্প) ¶ অপ্রকাশিত
সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা (প্রবন্ধ) ¶ অপ্রকাশিত
সমকালীন কাব্য-আন্দোলনের ধারা (স্মৃতিকথা) ¶ অপ্রকাশিত

Selected Poems : Translated by Kabir Choudhury ¶ Bangla Academy (in Press)

সম্পাদনা

আহত কোকিল (সম্পাদনা) ¶ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
আব্বাসউদ্দীন (সম্পাদনা) ¶ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
কাফেলা
গণকণ্ঠ
শিল্পকলা

Shilpakala

৪·

গ্রামোফোন রেকর্ড

11.003 45 Tours

La boucle d'or (ফরাসীতে অনুবাদ : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ;
আবৃত্তিতে কণ্ঠ : **Madeleine Renaud**, প্যারিস

MLP 2034 ঢাকা রেকর্ড
'কবিতা এমন' ; আবৃত্তিতে কণ্ঠ : প্রদীপ ঘোষ, বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোং লিঃ, ঢাকা

৫· **সাহিত্য পুরস্কার ও অন্যান্য সম্মান :**

বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (কবিতা)
জয়বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, কলকাতা (কবিতা)
হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (কবিতা)
জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার (কবিতা)
সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক (ছোটগল্প)
বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (কবিতা)
আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (ছড়া কবিতা)
শিশু একাডেমী (অগ্রনী ব্যাংক) পুরস্কার (ছড়া কবিতা)
অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (কবিতা)
কাফেলা পুরস্কার (কবিতা)

৬·

জীবনী

জন্ম : ১১ই জুলাই
পিতা : মীর আবদুর রব
মাতা : রওশন আরা মীর

পিতামাতা উভয়ে পরস্পর আপন চাচাতো ভাইবোন। জন্মস্থান : কুমিল্লা জেলার (সাবেক ত্রিপুরা জেলা) ব্রাহ্মনবাড়িয়া শহরের মৌড়াইল নামক মহল্লায়। আদি পূর্বপুরুষগণ সকলেই ধর্মপ্রচারক, পীর ও পরিব্রাজক শ্রেনীর আলেম। অতীতে পারিবারিকভাবে এরা আরবী ও ফারসী সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। প্রপিতামহ মীর মুনসী নোয়াব আলী প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি। যিনি নবীনগর থানার কাইতলা গ্রামের বিখ্যাত মীরবাড়ী থেকে পিতৃপুরুষদের ধর্মীয় শিক্ষার খানকা পরিত্যাগ করে ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়ায় আসেন এবং মৌড়াইলের মোল্লাবাড়িতে বিবাহ করেন। শিক্ষাশেষে স্থানীয় আদালতে একটি চাকুরী গ্রহণ করে শ্বশুরবাড়িতে স্থায়ী হন।

পিতামহ মীর আবদুল ওহাব ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জর্জ হাইস্কুলের (বর্তমান নিয়াজ মোহাম্মদ হাই স্কুল) আরবী ভাষায় শিক্ষক কাম কেরাণী। তিনি সংস্কৃত জানতেন। জারীগান ও পুঁথি লিখতেন। কবি বলেও যৎসামান্য খ্যাতি ছিলো।

পিতা মীর আবদুর রব ছিলেন বস্ত্রব্যবসায়ী। শহরের জগৎ বাজারে তাঁর কাপড়ের দোকানটিই ছিলো সকলের প্রিয়। পিতামহী বেগম হাসিনা

বানু মীর কবিকে লালন পালন করেন। দীর্ঘাংগী গৌরবর্ণা এই তেজস্বী মহিলা সিলেটের এক জোতদার কন্যা। লোকগাথা, কেচ্ছাকাহিনী ও রূপকথার ভাণ্ডার ছিলেন তিনি। বাংলা বর্ণমালা তিনিই কবিকে শিক্ষা দেন। এই মহিলার প্রভাব কবির জীবনকে সর্বদিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে। তাঁর আগ্রহেই কবিকে ব্রাহ্মনবাড়িয়া এম, ই, স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। এই স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় কবির একটি কবিতা ও গল্প তৎকালীন দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকার ছোটদের মজলিশে ছাপা হয়। তখন পত্রিকার ছোটোদের বিভাগটি পরিচালনা করতেন গৌরকিশোর ঘোষ (বেতালভট্ট)।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া এম,ই, স্কুল থেকে বেরিয়ে আল মাহমুদ নিয়াজ মোহাম্মদ হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে ভাষাবিদ্রোহ শুরু। বাহান্ন সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার রাজপথ ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের খবর দ্রুত সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং শুরু হয় দেশব্যাপী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবীতে আন্দোলন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাষা আন্দোলন কমিটির আহ্বানে আল মাহমুদ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলন কমিটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে কবি ট্রেনে ট্রেনে টিনের কৌটো হাতে বক্তৃতা করে বেড়াতে থাকেন। পুলিশ কবিকে গ্রেফতারের জন্য মোল্লাবাড়িতে হানা দেয়। সারাবাড়ি তছনছ করে ফেলা হয়। কবি আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। শুরু হয় গ্রামে গ্রামে পালিয়ে বেড়ানো। বিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক চিরকালের মত ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৫৪ সালে আল মাহমুদ ঢাকায় আসেন। ইতিপূর্বেই ঢাকা ও কলকাতার পত্র পত্রিকায় তার বেশ কিছু কবিতা ও গল্প প্রকাশ পায়। ঢাকার তৎকালীন দৈনিক মিল্লাতের প্রুফ সেকশনে তাঁর একটি চাকরী জুটে। ১৯৫৫ সালে তিনি মিল্লাত ছেড়ে ঢাকার সে সময়কার তরুণ লেখকদের পত্রিকা নজমুল হক সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'কাফেলা'য় সহ সম্পাদক রূপে যোগদান করেন। তিনি কাফেলায় নিয়মিত গল্প-কবিতা ও ফিচার লিখতে শুরু করেন। বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে। ফজল শাহাবুদ্দিন, শহীদ কাদরী ও ওমর আলীকে বন্ধু হিসাবে পান। ঠিক এসময় প্রগতিশীল লেখকদের সংস্থা 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' তাঁকে তাঁদের অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে আহ্বান জানালে সেখানে শামসুর রাহমান ও হাসান হাফিজুর রহমানের সাথে পরিচয় ঘটে। এ বছরেই তাঁর পিতার একান্ত ইচ্ছায় সৈয়দা নাদিরা বানুকে বিয়ে করেন।

তিনি ইত্তেফাকে যোগদান করেন। এ সময় তার বেশ কিছু কবিতা সমকালে প্রকাশ পেতে থাকে। লেখক—সাংবাদিকদের যৌথ প্রকাশনা সংস্থা 'কপোতাক্ষ' থেকে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ লোক লোকান্তর প্রকাশ পায়।

তাঁর 'কালের কলস' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ পেলে বাংলাদেশের আধুনিক কবিতায় মৌলিক অবদানের জন্য তাঁকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদী গণ আন্দোলনকে সমর্থন করায় তৎকালীন স্বৈরা-

চারী সরকার ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। আল মাহমুদ বইঘর প্রকাশনা সংস্থায় চাকুরী নিয়ে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে চলে যান।

স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশে প্রবল গণ আন্দোলন শুরু হয়। 'সমকালে' কবির সোনালি কাবিন সনেট গুচ্ছ প্রকাশ পেতে থাকে। ইত্তেফাক আবার প্রকাশের অনুমতি পেলে আল মাহমুদ ঢাকায় ফিরে এসে ইত্তেফাকের মফস্বল ডেস্কের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। এই বিভাগে থাকাকালীন কবির সাথে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যাপক পরিচয় ঘটে।

১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ঘাবড়ে যায়। ছ'দফার প্রবক্তা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে গড়িমসি চলতে থাকে।

১৯৭১ এ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ শুরু হলে ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ গভীর রাতে ঘুমন্ত ঢাকাবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইত্তেফাক অফিসটি মেশিনগানের গুলিতে ঝাঝরা হয়ে যায়। আগুন লাগিয়ে এর প্রতিটি বিভাগকে ভস্মীভূত করে দেয়া হয়। কবির টেবিলটিও কবিতা ইত্যাদির কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আল মাহমুদ গ্রামের দিকে পালিয়ে যান। আত্মীয় পরিজনের সাথে সন্তানাদি সহ স্ত্রী নাদিরাও ঢাকা ছেড়ে ভৈরব বাজারে কবির বোনের কাছে আশ্রয় নেন। এপ্রিলের দিকে কবি ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার নারায়ণপুর বাজার থেকে একদল মুক্তিযোদ্ধার সাথে আগরতলায় প্রবেশ করেন। পরে আসামের গৌহাটি হয়ে কলকাতায় এসে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর সাথে পশ্চিমবংগের কবি সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। সুনীল গংগোপাধ্যায়ের চেষ্টায় অরুণা প্রকাশনী থেকে আল মাহমুদের একটি কাব্য-সংকলন বেরোয়। ডিসেম্বরে দেশ হানাদার মুক্ত হলে আল মাহমুদ স্বাধীন মাতৃভূমিতে ফিরে যান।

১৯৭২ ঢাকা থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'গণকণ্ঠ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি র‍্যাডিক্যাল মতামতের জন্য সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। সম্পাদকীয়তে অধিকতর গণতন্ত্রের দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। কবির সাথে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মধুর থাকা সত্ত্বেও তিনি গণকণ্ঠের প্রগতিশীল মতামতকে সহ্য করতে পারেন না।

১৯৭৪ এর মার্চে আল মাহমুদ কারারুদ্ধ হন। প্রায় এক বছর তাঁকে জেলখানায় আটকে রাখায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তার মুক্তি দাবী করা হয়। এ্যামনেষ্টি ইন্টার ন্যাশলান তাঁর মুক্তির দাবীতে এগিয়ে আসেন। এ বছরেরই শেষ দিকে গণকণ্ঠের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়ে কবিকে মুক্তি দেয়া হয়। এর আগেই 'সোনালি কাবিন' বেরোয়।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি যখন অন্য কোনো পত্র পত্রিকায় জীবিকার চেষ্টা করছেন, তখন প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে শেখ সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠান এবং শিল্পকলা একাডেমীতে একটি চাকুরীর প্রস্তাব দেন। স্ত্রীর

পীড়াপিড়িতে কবিকে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করতে হয়।

শেখ মুজিব নিহত হন। খন্দকার মুশতাক ক্ষমতায় আসেন। ৭ই নবেম্বর দেশে সিপাহি জনতার মিলিত অভ্যুত্থান প্রেসিডেন্ট জিয়াকে ক্ষমতায় আনে।

১৯৫৬ এ কারাগারে রচিত 'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' বেরোয়।

১৯৫৮ থার্ড ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ারে দিল্লীতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব। বাংলাদেশে প্রকাশিত বইপত্রের ষ্টল খোলেন। আজমীড়ে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির মাজার জিয়ারত। পরে কলকাতার বইমেলায় অংশগ্রহণ।

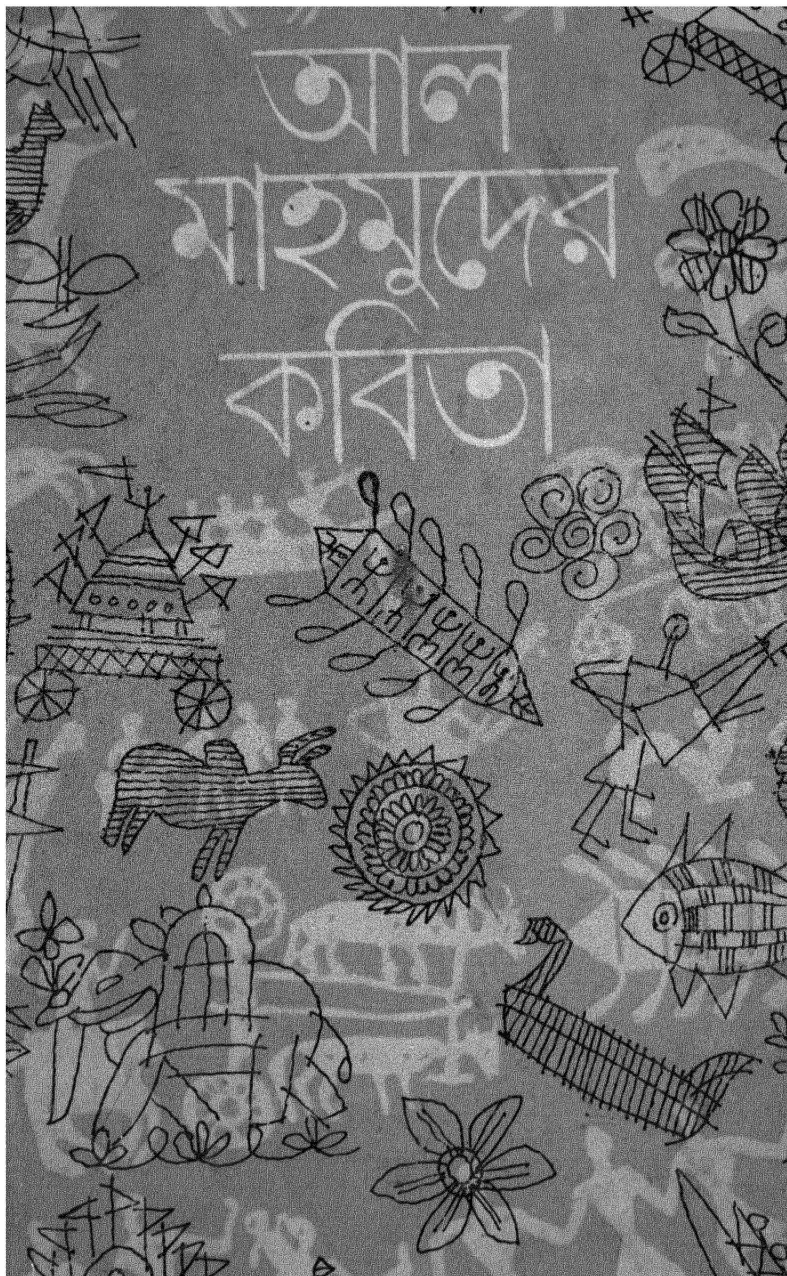
১৯৫৯ রাবেতা আলম আল ইসলামীর আমন্ত্রণে হজের উদ্দেশ্যে সৌদী আরব যাত্রা। মক্কা ও মদিনায় মাসাধিককাল অবস্থানের সুযোগ। হজ—মৌসুমে মিনায় অবস্থানকালে অকস্মাৎ প্যালেষ্টাইনী নেতা ইয়াসের আরাফাত মিনার রাবেতা সেমিনার হলে ভাষণ দিতে আসেন। কবি সেই সেমিনারে অন্যান্য বিশ্ব মুসলিম প্রতিনিধিদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। আল ফাতাহ নেতা আরাফাতের 'ইসলামের শক্তি' সম্পর্কিত অসাধারণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া কবি আল মাহমুদকে ডেকে পাঠান ও জাতীয় সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্র থেকে সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী ভাবধারাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে তাঁকে সহায়তা করতে অনুরোধ করেন। ফলে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট পদে আল মাহমুদ কাজ করতে সম্মত হন। এ সময় প্রেসিডেন্ট জিয়ার সাথে কবির একটি প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর কবিতার উচ্ছ্বসিত পাঠক হয়ে ওঠেন।

'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না' কাব্যগ্রন্থটি বেরোয়।

১৯৫১ সনের ৩০শে মে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হন। এই মহান নেতার শাহাদাৎ বরণে কবি মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত বোধ করেন ও সর্ব প্রকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। বর্তমানে সাহিত্য চর্চা ছাড়া তাঁর আর কোনো ব্রত নেই।

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী


আল
মাহমুদের
কবিতা